শুকতারা

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

চত্বারিংশৎ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন • ১৩৯৭

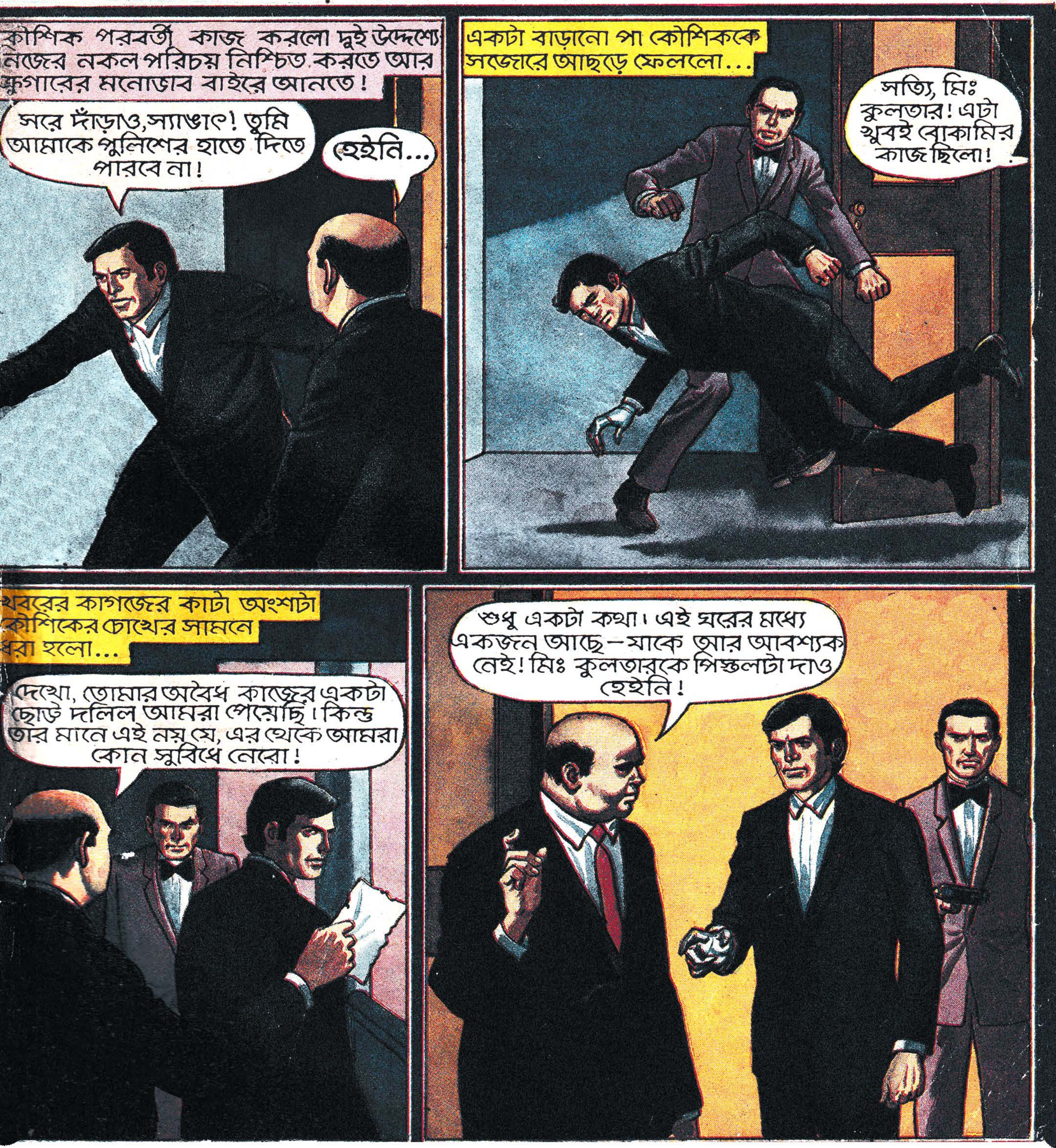

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হরিদাস পাল ও সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

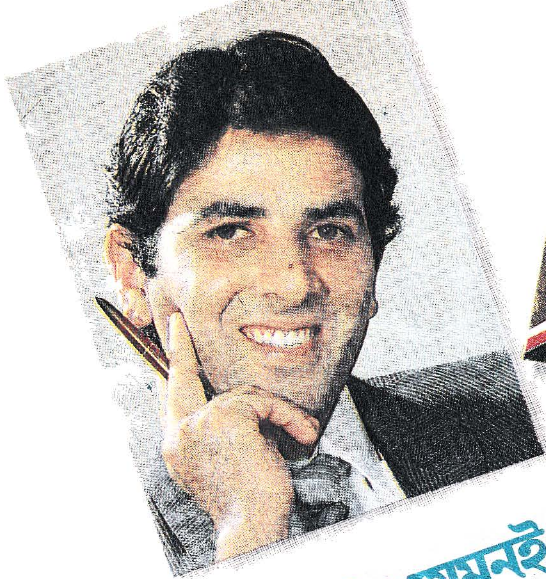

আপনার চুলের স্টাইল যেমনই হোক না কেন
কেয়ো-কার্পিনে আপনাকে দারুণ স্মার্ট দেখাবে!

চুলের স্টাইল যাই হোক না কেন, তার সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাবটি থাকবে না।

আর সেইজন্যেই আপনি স্টাইল পাল্টে পাল্টে দেখতেও পারবেন, কোন স্টাইল আপনাকে সব থেকে বেশি ভালো লাগে।

১০০ মি·লি ও ৩০০ মি·লি শিশিতে পাওয়া যায়।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।

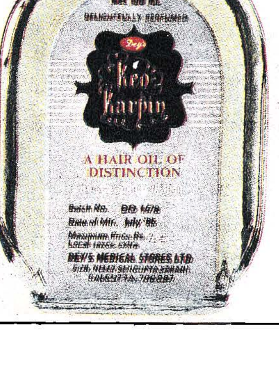

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল।
কেয়ো-কার্পিন চুল।

Dey's®

যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-10

বাঁটুল দি গ্রেট

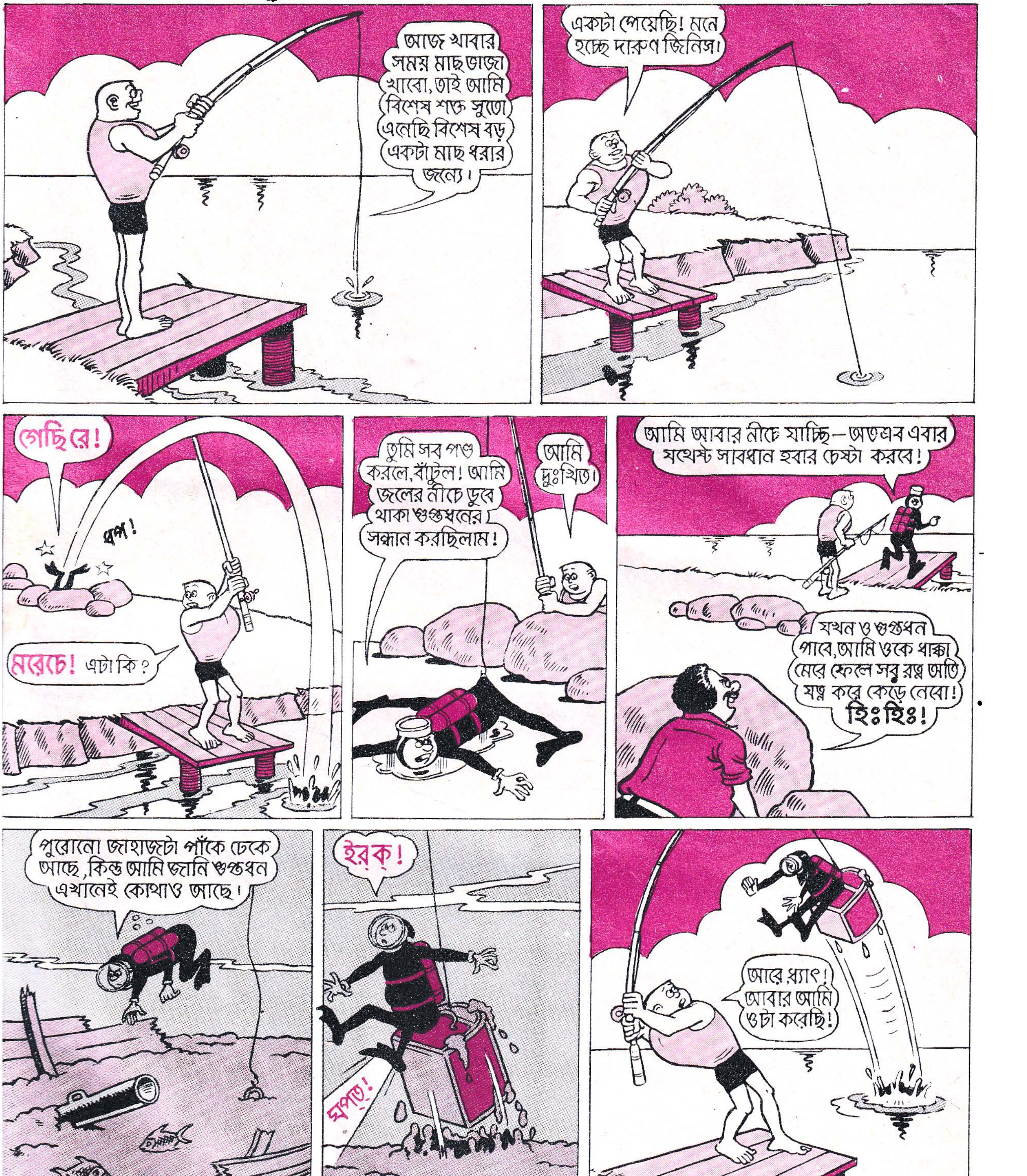

আজ খাবার সময় মাছ ভাজা খাবো, তাই আমি বিশেষ শক্ত সুতো এনেছি বিশেষ বড় একটা মাছ ধরার জন্যে।
একটা পেয়েছি! মনে হচ্ছে দারুণ জিনিস!
গেছি রে!
ধপ!
মরেচে! এটা কি?
তুমি সব পণ্ড করলে, বাঁটুল! আমি জলের নীচে ডুবে থাকা গুপ্তধনের সন্ধান করছিলাম!
আমি দুঃখিত।
আমি আবার নীচে যাচ্ছি—অতএব এবার যথেষ্ট সাবধান হবার চেষ্টা করবে!
যখন ও গুপ্তধন পাবে, আমি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে সব রত্ন অতি যত্ন করে কেড়ে নেবো! হিঃ হিঃ!
পুরোনো জাহাজটা পাঁকে ঢেকে আছে, কিন্তু আমি জানি গুপ্তধন এখানেই কোথাও আছে।
ইরক্!
ঘপাৎ!
আরে ধ্যাৎ! আবার আমি ওটা করেছি!

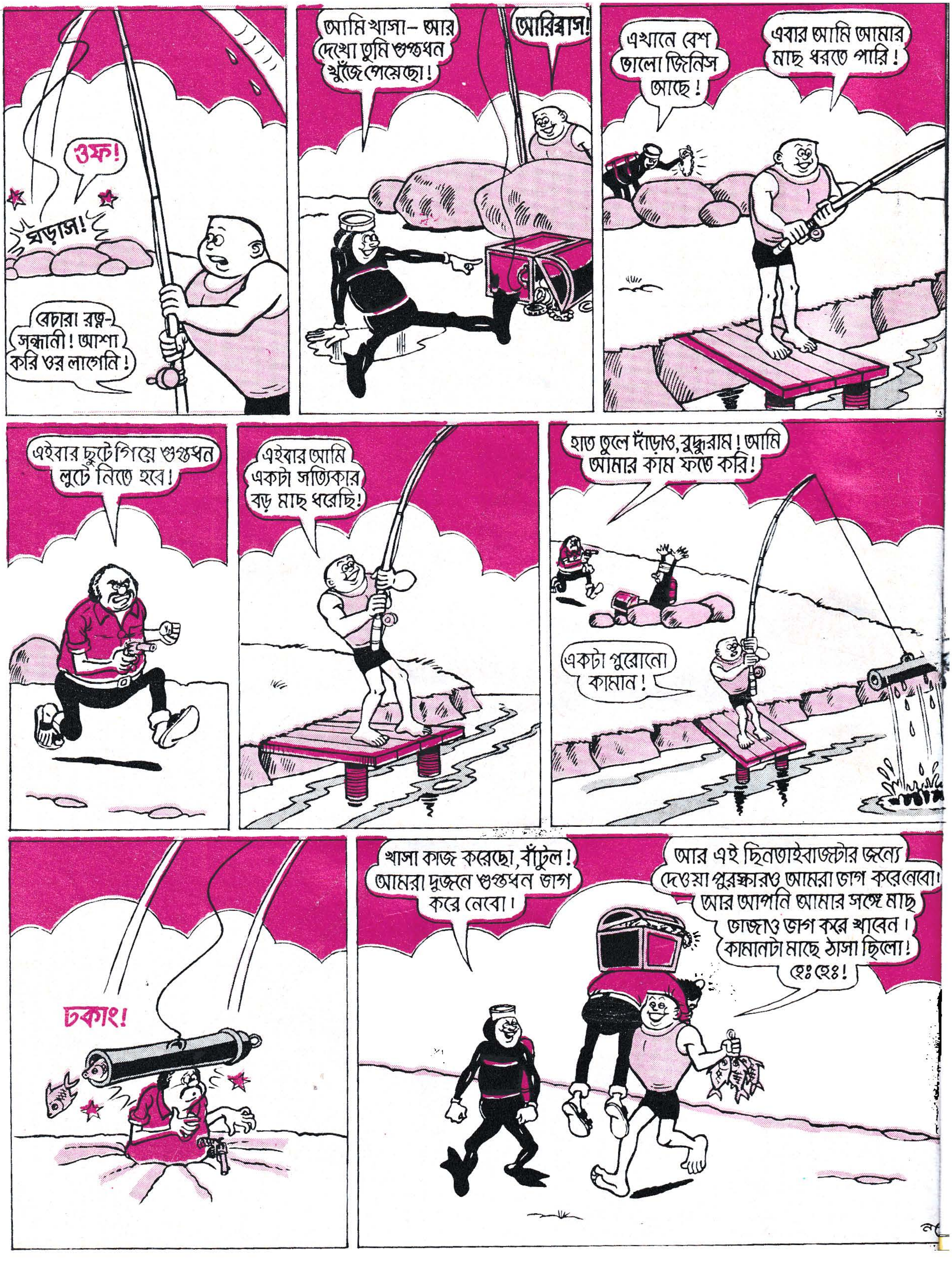
ওফ!
ঘড়াস!
বেচারা রত্ন-সন্ধানী! আশা করি ওর লাগেনি!
আমি খাসা— আর দেখো তুমি গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছো!
আরিব্বাস!
এখানে বেশ ভালো জিনিস আছে!
এবার আমি আমার মাছ ধরতে পারি!
এইবার ছুটে গিয়ে গুপ্তধন লুটে নিতে হবে!
এইবার আমি একটা সত্যিকার বড় মাছ ধরেছি!
হাত তুলে দাঁড়াও, বুদ্ধুরাম! আমি আমার কাম ফতে করি!
একটা পুরোনো কামান!
ঢকাং!
খাসা কাজ করেছো, বাঁটুল! আমরা দুজনে গুপ্তধন ভাগ করে নেবো।
আর এই ছিনতাইবাজটার জন্যে দেওয়া পুরস্কারও আমরা ভাগ করে নেবো। আর আপনি আমার সঙ্গে মাছ ভাজাও ভাগ করে খাবেন। কামানটা মাছে ঠাসা ছিলো! হেঃ হেঃ!

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের
মাসিক পত্রিকা

ফাল্গুন **শুকতারা** ১৩৯৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 538 (17) 1 (9) T.B.C. (dated 21.7.86)

সূচীপত্র

১। মৃত্যুদূতের কালোছায়া (ছবিতে গল্প)
—নারায়ণ দেবনাথ প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
৩। রহস্য-ফাঁস (কবিতা)—শৈলেনকুমার দত্ত ৫
৪। বৃশ্চিকের পদক্ষেপ (গোয়েন্দা গল্প—
রঙিন ছবিতে)—ইন্দ্রনীল ঘোষ ৬
৫। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৩২)
(অগ্নিযুগের সৈনিক)—সুধীন্দ্রনাথ রাহা ৮

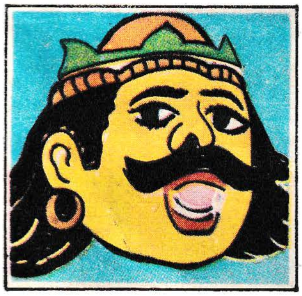

৬। সাহসী (ভূতের গল্প) —মঞ্জিল সেন ১২
৭। মানুষ (রূপকথা) —প্রশান্ত চক্রবর্তী ১৫
৮। গড় চামুণ্ডেশ্বর (রহস্য গল্প)
—শিশিরকুমার মজুমদার ১৮
৯। নক্ষত্রেরা কতো দূরে (বিজ্ঞানের গল্প)
—প্রবীরকুমার আদিত্য ২৪
১০। অবাক কাণ্ড ২৫
১১। লোভী বিচারক (গল্প)—নমিতা বসাক ২৬
১২। স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প-বিজ্ঞানের গল্প) ২৮
১৩। যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) —সব্যসাচী ৩০
১৪। খেলাধূলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫
১৫। ক্রস লি (ছবিতে গল্প) —ডিভোনো ও ম্যাটেরা ৪৬
১৬। অমৃতের পুত্র (সত্য ঘটনা) —নন্দলাল ভট্টাচার্য ৪৮
১৭। পাণ্ডব গোয়েন্দা (পাণ্ডবদের নতুন
অ্যাডভেঞ্চার) —ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৫২
১৮। অংক জগতের জাদু (ম্যাজিক)
—জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ৫৮

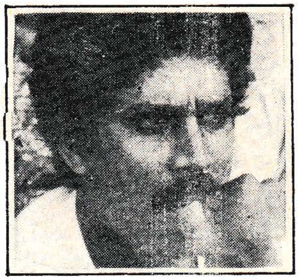

১৯। মকরন্দবীপের রহস্য (ধারাবাহিক
রহস্য উপন্যাস)—রাধারমণ রায় ৫৯
২০। চুপ সার্কাস চলছে (হাতে কলমে)
—গংগেশ ঘোষ ও মদন মুখোপাধ্যায় ৬৩
২১। বাসা (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)
—অমিতাভ গংগোপাধ্যায় ৬৪
২২। প্রাপ্তি (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)
—গার্গী সেন পুরকায়স্থ ৬৫
২৩। গোপালচন্দ্র দে স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতা (ঘোষণা) ৬৬
২৪। ভেবে ভেবে বলো (কুইজ) ৬৭
২৫। হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প)
—নারায়ণ দেবনাথ ৬৮
২৬। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৭০
২৭। আফ্রিকার জংগলে (ভ্রমণ-কাহিনী)
—অমিয়কুমার হাটি ৭৩
২৮। কাজীর কীর্তি (কবিতা) —শেখর আহমেদ ৭৬
২৯। দাদুমণির চিঠি ৭৭
৩০। তোমাদের পাতা ৭৮
৩১। মাসের নাম মার্চ (ফিচার) —আরতি বসু ৮০

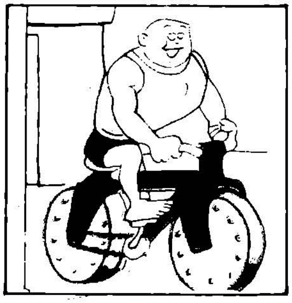

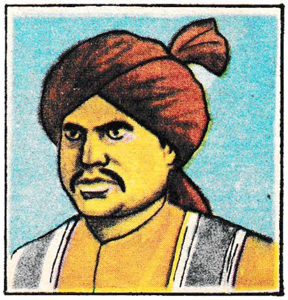

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ৫৩ টাকা। ডাকে— বুকপোস্টে ৬৫, রেজিস্ট্রি ডাকে ১১১ টাকা। প্রতি সংখ্যা—টাঃ ৪·০০

মায়ের স্নেহের মতোই খাঁটি

কুক্‌মী'র

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা

কুক্‌মীর ডাটা গুঁড়ো মশলা
অন্য কিছুর সঙ্গে এর তুলনাই হয় না

কুকমীর ডাটা গুঁড়ো মশলায় রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নেই ফলে স্বাদ আর অন্যান্য গুণ একেবারে বাটা মশলার মতোই অকৃত্রিম। কুকমীর ডাটা গুঁড়ো মশলা ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমি ভাবতেই পারি না। একমাত্র কুকমীর ডাটা গুঁড়ো মশলাই সরকার অনুমোদিত যা আপনার রেশন দোকানে ও খোলা বাজারে নিয়মিত পাবেন।

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

BRIGHT

শুকতারা

০শ বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● ফাল্গুন, ১৩৯৩/ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

রহস্য-ফাঁস

শৈলেনকুমার দত্ত

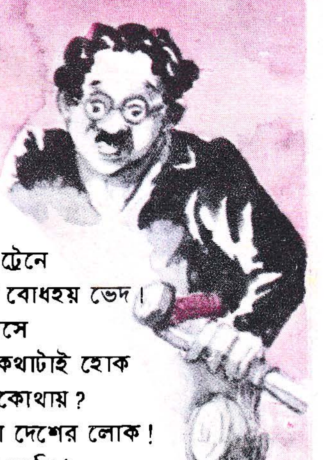

গুজরাটেতে খেদা জেলার গ্রামে
মিলল হঠাৎ খুঁড়তে গিয়ে মাটি
চারটি বিশাল ডাইনোসরের ডিম
গবেষণায় প্রমাণ হলো খাঁটি!
বৈজ্ঞানিক আর ভূতাত্ত্বিকে মিলে
দফায় দফায় কী-সব নিয়ে বসে
ছ'কোটি সাল আগের ফসিল বটে
রায় দিয়েছেন হিসেব-নিকেশ কষে!
খবর পেতেই ঘনাদা উৎসাহে
নিয়ে গেলেন টেনিদাকেও ধরে
এসব দেখে ব্রজদা কী করেন
হাজির হলেন সাইকেলেতে চড়ে।
বক্সীবাবু, ব্যোমকেশ যাঁর নাম
এলেন নিয়ে অন্বেষণের জেদ
ফেলুদারাও এলেন পরের ট্রেনে
রহস্য তার করতে বোধহয় ভেদ।
সবাই যখন বুদ্ধি খাটায় বসে
টেনিদা ক'ন—হক কথাটাই হোক
ডিম যে বটে, কুসুম গেল কোথায়?
তবে যে কয় গোটা দেশের লোক!
কহেন ব্রজ—কুসুম কোথায় পাবি!
আমি সেবার মস্ত কড়াই মেজে
রাম যখনই অযোধ্যাতে ফেরেন
উৎসবেতে খাইয়েছিলাম ভেজে।
সেসব খোসাই ফেলেছিলাম ছুঁড়ে
ভাবিনি এই কান্ড হবে পরে—
রহস্য তাই করতে এলাম ফাঁস
লক্ষ্মীসোনা ফেরো যে যার ঘরে!

ছবি: রাহুল মজুমদার

তার আগেই আমি তোমাকে ধরব কালাচাঁদ।
আ-আহ,
এবার বল...। আমি যা জানতে চাই।
ক্-কি, কি জানতে চাও তুমি
আ-আহ !!
তোমার বস্, দু-মুখোর ঠিকানা !
জানিনা। দু-মুখোকে চিনিনা !
আবার মিথ্যেকথা। দাঁড়ার চাপ আরেকটু বাড়াব নাকি ?
আঃ-আঃ।
বলছি বলছি-
শহরের উত্তরে, একটা বাড়ি... এ-এই যে ঠিকানা !
চল্ তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আবার রওয়ানা হব।
ওদিকে দুমুখো-
যাক্। আপাততঃ কিছুদিন নিশ্চিন্ত। সামনের মাসে জাহাজে ওদের সংগে দেখা হবে। ফাইল তুলে দেব ওদের হাতে।
কিন্তু কালু তো এখনও ফিরলনা বস্!
কালু আর ফিরবেনা। দু-মুখো তোমার খেল খতম !

এ—আবার কে ?!
তোমার যম—বৃশ্চিক !
বৃশ্চিক ?! তুমি কোথাকার ভাঁড় এলে বাবা ?!
ভাঁড় কিনা এখনই টের পাবে, ফাইলটা বের করে দাও !
থাপা, তেজা, ব্যাটাকে মেরে শুইয়ে দাও !
মার ভাঁড়টাকে।
তার আগে তোমরা একটু বিশ্রাম কর বাছাধনরা !
ক্র্যাং
ওঃ-
শ-শ-শ-শ
এবার······ ···মরবি তুই ! আঃ ফস্কাল !
আঃ !!
তুইও বাঁচবিনা !
থাপার ছুরির ছোবল থেকে এখনও অব্দি কেউ বাঁচেনি।
।১৪

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৩২)

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

"গান্ধী মহারাজকী জয়!"—ধ্বনি উঠছে মুহুর্মুহু। ধ্বনি উঠছে অন্ততঃ পাঁচশো সাঁওতালের সমবেত কণ্ঠ থেকে। দনুরাজার মাঠে জমায়েত হয়েছে তারা।

দিগন্তছোঁয়া মাঠের কোণে কোণে ছোট ছোট কিছু সাঁওতাল পল্লী। ঐসব পল্লীর বাসিন্দারাই আবাদ করে দনুরাজার মাঠ। বেশী নয়, দেড়শো বছর আগেও বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু জন্মাত না এখানে, ওরাই এল ছোটনাগপুরের কোন এক নাম-না-জানা জঙ্গল থেকে। কারও কাছে কোনো অনুমতি না নিয়ে লেগে গেল বাদাবনকে আবাদ করে ফেলার কঠিন কাজে।

কাজ অবশ্যই কঠিন। কিন্তু মানুষগুলিও ছিল কঠিন। একেবারে যাকে বলা যায় লোহার মানুষ। সত্যি সত্যি ঊষর প্রান্তরে সোনা ফলিয়ে ছেড়েছিল তারা। ডাঙা জমি, ধান এখানে হয় না। তবে পাট হয়, সরষে হয়, তামাক হয়, অড়হর হয়, আর চাই কী! ইদানীং গমের চাষও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে, যদিও গোড়ায় গমকে ওরা গ্রাহ্যের ভিতরই আনেনি। বলতে গেলে সে-যুগে খাদ্য হিসাবে বাংলা বা ছোটনাগপুর অঞ্চলে ওটা জনপ্রিয় ছিল না।

যা বলছিলাম, তেপান্তরের কোণে কোণে ছোট ছোট পল্লী, কোনো পল্লীতেই সবে মিলিয়ে পঞ্চাশ জনের বেশী মানুষ নেই। বুড়ো মানুষ, ছেলেমানুষ, মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ—সব মিলিয়ে বড়জোর পঞ্চাশ। তা, মাঠের মাঝখানে এই ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখে পড়ে গোটা বারো পল্লী, তাহলে এ তল্লাটের সাঁওতালরা গুনতিতে দাঁড়ায় ছয়শোর কাছাকাছি!

তা, প্রায় সেই ছয়শো লোক সবাই এসেছে, এবং তাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচশো জন আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে যাচ্ছে—"গান্ধী মহারাজকী জয়"—

সবুর! এ-গান্ধী কিন্তু সবরমতীর মহাত্মা গান্ধী নন। ভারতে যাঁর "জাতির জনক" বলে প্রসিদ্ধি, ইনি তিনি নন। "গান্ধী" বলতে দনুরাজার মাঠের এই সাঁওতালেরা বোঝে জীতু ছোটকা-কে। ঐ যে উত্তর পূবের গাঁ-খানা, লম্বা বাঁশের মাথায় হলদে পতাকা উড়ছে যেখানে। ঐখানে বাস জীতু ছোটকার। ছোটকা কেন? যে কারণে এই জীতুকে ছোটকা বলা হয়, তা হলো এই যে, তিন পুরুষ আগে আর এক জীতু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখানকার এই সাঁওতাল গোষ্ঠীতে, অসামান্য পুরুষ বলে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, শুধু সাঁওতালদের মধ্যেই নয়, গোটা দিনাজপুর জেলাটার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-মুসলমান-খ্রীশ্চান সব সমাজেই। কর্মবীর তো ছিলেনই তিনি, তার উপরে আবার ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। সর্বস্তরের মানুষ তো তাঁর খাতির রেখে চলতই, তার উপরে আবার যক্ষরক্ষ ভূত প্রেত দত্যি দানোরাও ছিল তাঁর আজ্ঞাবহ। যা তিনি ইচ্ছে করতেন, করতে পারতেন তাই।

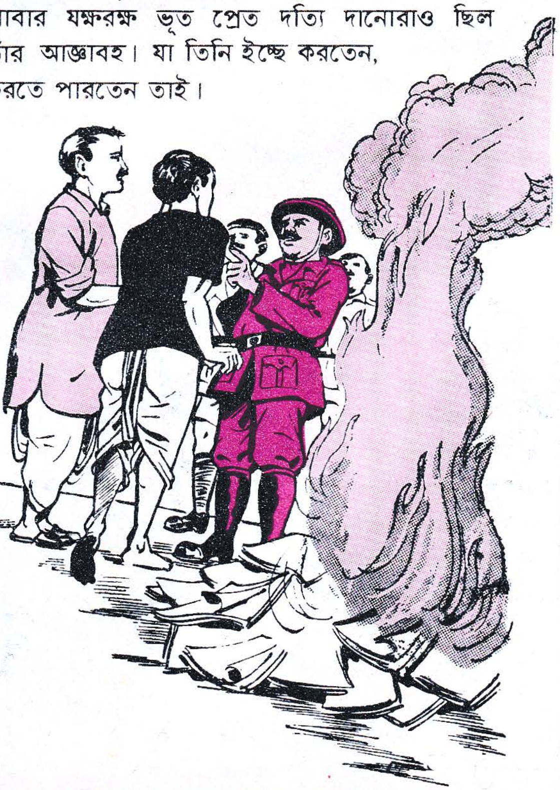

ঘরোয়া মারামারিতে একবার একটা খুন হয়ে গিয়েছিল দনুরাজার মাঠে, কী করে যেন খোঁজও পেয়ে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু পুলিশের নাকি এমন সাধ্য হলো না যে তারা এ-মাঠের ভিতরে এসে ঢোকে। যে দিক দিয়েই তারা এগিয়ে আসে মাঠের দিকে, পথ হারিয়ে ফেলে। সারাদিন বা সারারাত ঘুরে ঘুরে গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার পরে একসময় তারা দেখতে পায় যে, যেখান থেকে তারা রওনা হয়েছিল, ফের আবার সেইখানেই ফিরে এসেছে সদলবলে।

যাক, সেই জীতু মহারাজ এখনও অমর হয়ে আছেন সাঁওতাল সমাজে, আদর্শ মানব রূপে। তাঁর তিরোধানের পর থেকে আর কেউ এ-যাবৎ ছেলেদের নাম 'জীতু' রাখতে সাহস পায়নি।

তবে এই জীতু ছোটকার কেমন করে 'জীতু' নামকরণ হলো?

নামকরণ জন্মমুহূর্তে বা জন্মের অব্যবহিত পরেই হয়নি এঁর। জীবনের প্রথম ত্রিশটা বছর এঁর অন্য নাম ছিল, কেউ বলে বেঙ্কটিয়া, কেউ বলে 'ভিউয়ানি'। সেই বেঙ্কটিয়া বা ভিউয়ানি বা অন্য কিছু নামকে আশ্রয় করেই ইনি ঐ ত্রিশ বছরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বসলেন অসামান্য পুরুষ বলে।

সামাজিকেরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে, বেঙ্কটিয়া, ভিউয়ানি বা অন্য যে-কোনো নামই ইনি এ-জন্মে আশ্রয় করে থাকুন না কেন, আসলে ইনি নরদেহধারী সেই পুরাতন জীতু মহারাজ ছাড়া অন্য কিছু নন। অতএব এখন থেকে এঁকে জীতু বলেই অভিহিত করা হোক। তবে পুরাতন জীতুর থেকে ইনি যে এক আলাদা মানুষ, এটা বোঝাবার জন্য যোগ করা হোক 'ছোটকা' বা 'কনিষ্ঠ' শব্দটি। সেই থেকে, ইনি জীতু ছোটকা বলেই পরিচিত সাঁওতাল সমাজে। এবং যেহেতু গোটা ভারতবর্ষে এখন শ্রেষ্ঠ মানব বলে পরিচিত হচ্ছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজি, সেই কারণেই জীতু ছোটকাকেও সর্বসম্মতিক্রমে নাম দিল "আমাদের গান্ধী"। সেকালে যেমন ছিল 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ভারতবর্ষে, একালে তো 'গান্ধী'ও তেমনি। যে-প্রদেশে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি অবশ্যই গান্ধী নাম পেতে পারেন গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে। ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে—সীমান্ত গান্ধী, বালুচ গান্ধী, সোদপুরের গান্ধী, ইত্যাদি।

সুতরাং জীতু ছোটকা হলেন সাঁওতাল গান্ধী দিনাজপুরের। তিনিই এই ছয়শো সাঁওতালের অবিসম্বাদী নেতা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিধিপ্রেরিত শাসক ও প্রতিপালক। প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার, যা খুশী তাই বলা যেতে পারে। জনসংযোগের জন্য তাঁর এক সহকারী আছেন, সামু তাঁর নাম। শক্তিমান? নিশ্চয়। বুদ্ধিমান? তাও নিশ্চয়। সেই শক্তি ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করে তাঁর অন্তরে গজিয়ে উঠেছে এক দুর্দান্ত উচ্চাভিলাষ। হাতের কাছেই মোক্ষম হাতিয়ার রয়েছে সামুর। সেই হাতিয়ারটিকে ঠিকমত খেলানো যায় যদি, নামে না হোক, কার্যত সামু সাঁওতাল অবশ্যই এ তল্লাটের শাহানশা বনে যেতে পারেন। হাতিয়ারখানি আর কিছু নয়, জীবন্ত জীতু ছোটকা গান্ধী মহারাজ!

মনে মনে এক নিখুঁত পরিকল্পনা গড়ে ফেললেন সামু সাঁওতাল। সারা দেশে লেগেছে স্বরাজের হাওয়া। সে-হাওয়া ঝড়ের বেগে বইতে শুরু করেছে উত্তর বঙ্গেও। খাস দিনাজপুর শহরে, শত শত পুলিশের নাকের ডগায় পাহাড়-প্রমাণ বিলিতী কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল স্বদেশী ভলেন্টার ছেলেরা। বীরচাঁদ সাঁওতাল তা তো নিজের চোখেই দেখে এসেছে! পুলিশ কিছু করতে পারেনি। স্রেফ কিছু না। লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল বই কি! তা তারা গিয়েছিল। কিন্তু জোঁকের মুখে নুন পড়লে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাতেই তাদের ফিরে যেতে হয়েছিল ফাঁড়িতে। যাদের দোকান থেকে বিলিতী কাপড় তুলে এনে বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, সেই দোকানদারেরাই মারমুখো হয়ে উঠেছিল পুলিশের উপরে—"আমাদের মাল, আমরা পোড়াই যদি, তোমাদের কী হে?"

"তোমরা পোড়াচ্ছ?"—অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল পুলিশ।

"আলবৎ"—একবাক্যে জবাব দিয়েছিল দোকানীরা—

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা

ধবল বা শ্বেতীর চিকিৎসা

সাদা দাগ অসাধ্য নয়। সঠিক চিকিৎসায় যেকোন অসুখের মত এ রোগ ও সেরে যায়। বহু বছরের গবেষণায় সাদাদাগ সারাতে আমরা সাফল্য লাভ করেছি

চিকিৎসা এতই শক্তিশালী যে একবার ব্যবহারেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে। আপনি যদি বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা ১ বার পরীক্ষা করে দেখুন। রোগ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামর্শ বা পূর্ণ চিকিৎসার জন্য লিখুন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন।

পাকা চুল কালো

কলপে নয়, আমাদের আয়ুর্বেদিক তেল ব্যবহারে চুল পাকা ও ঝরা রোধ করে এবং পাকা চুলকে কালো করে। ইহা ব্যবহারে স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক ও চোখের দুর্বলতা দূর করে। তিন শিশি এক কোর্স Rs. 60/- ডাক খরচ পৃথক।

SHRI AYURVEDIC PHARMACY (S.K)
P.O. KATRI SARAI (GAYA)

"মহেশলালের দোকান থেকে কাপড় বার করে দিয়েছে মহেশলালের ছেলে, ভবানীপ্রসাদের দোকান থেকে তারই জামাইমেয়ে জোড় বেঁধে। এ-অবস্থায় মহেশলাল বা ভবানীপ্রসাদ কি পুলিশের দ্বারস্থ হবে ছেলে-মেয়ে-জামাইকে ঠ্যাঙাবার জন্য?"

সুতরাং পুলিশকে পিছু হটতে হয়েছে। এমনি সর্বত্র। দনুরাজার মাঠে কাপড়ের দোকান নেই, এখানে বিলিতী পোড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তার চেয়ে জবর কিছু তো অনায়াসেই করা যায়। স্বদেশী ভলেণ্টাররা চাইছে স্বরাজ আনতে। স্বরাজ মানে কী? নিজের দেশ নিজে শাসন করব, এই তো? সাহেবদের তাড়িয়ে দেব, এই তো?

তা সেকাজ তো আগেও সাঁওতালেরা করেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতি এখনো জাজ্বল্যমান সাঁওতাল জাতির মগজে মগজে। তখন সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ সাঁওতালেরা ছিল একা। সারা দেশে ছিল তাদের প্রচেষ্টায় উদাসীন। কিন্তু এখন তো সারা দেশই জেগে উঠেছে, ইংরেজ তাড়াবার জন্য এককাট্টা হয়েছে সবাই। এখন যদি মাথা চাড়া দেওয়া যায় আর একবার–

দনুরাজার মাঠে সাঁওতাল ছয়শো। এ রকম মাঠ, এরকম

এ ধর্মস্থানের কোনো অমর্যাদা আমাদের দ্বারা হবে না।

সাঁওতালী উপনিবেশ এই দিনাজপুর জেলাতেই আছে গোটা কুড়ি আরও। তা হলে অন্ততঃ বারো হাজার সাঁওতাল এই একটা জেলাতেই। উত্তর বঙ্গের সব জেলাতেই এইরকম আছে। বেশীই আছে এর চাইতে কোনো কোনো জেলাতে। সব মিলিয়ে লক্ষ পেরিয়ে যাবে হয়ত! এর মধ্যে তীর ধনুক ধরতে পারে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার তো নিশ্চয়ই! এদের এক ঝাণ্ডার নীচে জমায়েত করতে পারলে ভাবনা কী আছে?

সাঁওতাল-গান্ধী জীতু ছোটকা নিজে এসব ব্যাপারে কখনও উৎসাহী হতেন না। কিন্তু সামু সকালে বিকালে তাঁকে তাতিয়ে তুলছেন। তাঁর নামের দোহাই দিয়ে মজলিশ ডাকছেন এ-মাঠে ও-মাঠে, সারা জেলায়। সামুর উপরে যথেষ্ট স্নেহ-দুর্বলতা জীতুর, তিনি সায় না দিয়ে পারছেন না সামুর কার্যকলাপে।

মাস দুইয়ের ভিতরে সারা জেলায় প্রচার হয়ে গেল, সাঁওতালেরা আর ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করবে না। আর শুধু ইংরেজই বা বলি কেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো শক্তির কাছেই মাথা নত করবে না তারা। মানবে তারা শুধু জীতু ছোটকাকেই। তিনিই তাদের গান্ধী। গান্ধী বলতে তারা এখন বোঝে ঠিক সেই জিনিস, প্রাচীন ইউরোপের লোকে যা বুঝত–'সীজার' বা 'অগস্টাস' বলতে। এক কথায় সম্রাট।

"গান্ধী মহারাজকী জয়"–দনুরাজার মাঠে ধ্বনি উঠছে পাঁচশো সাঁওতালের। কাহিনীর আরম্ভে এই দৃশ্যই দেখানো হয়েছে। একটা ঢিবির উপরে যোদ্ধৃবেশী সামু। আর আধা-যোদ্ধা আধা-সাধু বেশী জীতু ছোটকা দাঁড়িয়ে। ১৯৩২ সালের ২রা ডিসেম্বর। সামুর মুখ থেকে বেরুচ্ছে অগ্নিগর্ভ ভাষণ। "ওঠো, জাগো। গোরার রক্তে দেশ ডুবিয়ে দাও"– এই তার বক্তৃতার বয়ান। জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠছে। বল্লমের ডাঁটিতে ভর দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে এক একজন, উত্তেজনার আতিশয্যে।

তার পরদিনই জীতু ছোটকাকে নিয়ে সামু চলে গেল জেলার অন্যসব সাঁওতাল উপনিবেশ পরিক্রমায়। সর্বত্রই একই দৃশ্য। উত্তেজিত জনতার বিপুল সমাবেশ। সামুর বক্তৃতা, জীতুর কণ্ঠে ফুলের মালা। এবং সর্বশেষে স্থানীয় ওঝার বক্ষরক্ত দিয়ে জীতুর কপালে জয়তিলক। এক সপ্তাহের মধ্যেই জীতু-সামুর দনুরাজার মাঠে প্রত্যাবর্তন এবং অস্ত্রসজ্জা শুরু। অস্ত্রসজ্জা বলতে অবশ্য বেশী বেশী তীরধনুক আর সড়কি বল্লম গড়ানো, এবং বাচ্চা ছেলেদের সে অস্ত্রপ্রয়োগে তালিম দেওয়া।

এত সব হৈ চৈ, তোড়জোড়, বিলম্বে হলেও একদিন তো সেসব পুলিশের কানে উঠবেই। বিলম্ব হলো। কারণ সাঁওতাল উপনিবেশগুলিতো সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নই থাকে সব জায়গায়। তার উপর, সাঁওতাল সমাজে বেইমান জন্মে না কোনও কালে। ঘরের কথা বাইরে গিয়ে শত্রুর কানে দিয়ে আসবে, এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কোনো

সাঁওতাল।

কিন্তু তবু, খবর একসময়ে পেলোই পুলিশ। কী করে পেলো, জিজ্ঞাসা করলে পুলিশেরা নিজেরাও কিছু বলতে পারত না নিশ্চয় করে। কিন্তু পেলো তারা খবর যে আজগুবি এক কান্ড ঘটতে যাচ্ছে দিনাজপুর জেলায়। তীর-ধনুক সম্বল সাঁওতালেরা তাদের নিজস্ব এক গান্ধীকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা আর ইংরেজ সরকারের তাঁবেদার হয়ে থাকবে না।

খবরটা প্রথমে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল বই কি, কিন্তু যখন তদন্তের ফলে জানা গেল যে জনরবটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছে, তখন সাজ-সাজ রব পড়ে গেল শাসন কর্তৃমহলেও। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিলিটারি চেয়ে পাঠালেন কলকাতায়। এবং মিলিটারির জন্য অপেক্ষা না করে, দিনাজপুরের সমস্ত পুলিশ পল্টন একত্র করে ধাবিত হলেন দনুরাজার মাঠের অভিমুখে।

তারিখটা ছিল ১০ই ডিসেম্বর। সারা বাংলা বিহারের সাঁওতালেরা আজও সে-দিনের কথা ভুলতে পারেনি। ভুলতে চায়ও না। যে-যুদ্ধের কথা স্মরণ করে গৌরবে স্ফীত হয়ে ওঠে তাদের বুক, তার শুরু সেইদিন। গৌরব? নিশ্চয়ই। যদিও সংগে সংগেই সেদিনের সে রক্তগংগার কথা স্মরণ করে ভেঙেও যেতে চায় তাদের বুকগুলো। সে-রক্ত ঢেলেছিল যে তাদেরই আত্মীয় জনেরা!

আদিনা মসজিদ দিনাজপুরের অন্যতম প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি। খোলা মাঠের ভিতর পুলিশের রাইফেলের সম্মুখীন হওয়া যে সমীচীন হবে না সাঁওতালদের পক্ষে, এ জ্ঞান তাদের বিলক্ষণ ছিল। তাই, যেই তারা খবর পেল যে পুলিশ ফৌজ দনুরাজার মাঠের দিকেই ছুটে আসছে। তারা অমনি পুলিশের পাশ কাটিয়ে ঘুর-পথে গিয়ে উপস্থিত হলো শহরের প্রান্তসীমায় আদিনা মসজিদে। বিপুলায়তন অট্টালিকা, পরিখা থাকলে তাকে একটা দুর্গই বলা চলত। গড়ন পেটন এবং রক্ষাব্যবস্থা সেখানে একটা কেল্লারই মতন প্রায়। আপৎকালে এইখানেই আশ্রয় নেওয়া হবে বলে সামু আগে থেকেই স্থির করে রেখেছেন।

দনুরাজার মাঠের সব সমর্থ জোয়ান তো বটেই, অন্যান্য সাঁওতালী উপনিবেশের যোদ্ধারাও সমবেত হয়েছে আদিনা মসজিদে। জীতু ছোটকা আশ্বাস দিয়েছেন মসজিদের ইমামকে—"সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করি আমি। এ-ধর্মস্থানের কোনো অমর্যাদা আমাদের দ্বারা হবে না। তবে আপৎকালের আশ্রয় হিসেবে একে ব্যবহার না করে আমাদের উপায়ান্তর নেই। আপনারা তাতে বাধা দেবেন না দয়া করে।"

ইমাম তাঁর সহকারীদের নিয়ে নিঃশব্দে মসজিদ ত্যাগ করে এসেছেন এই কথা শুনে। না করে তিনি করবেন কী? পুলিশ তো হাতের কাছে নেই। অথচ তীরন্দাজ সাঁওতালেরা ধনুকে তীর জুড়ে সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। ওরা মরিয়া লোক। ওদের কথার অবাধ্য হয়ে মরণকে ডেকে আনা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

দনুরাজার মাঠ থেকে ফিরে আসতে দেরি হলো না পুলিশ ফৌজের। আদিনা মসজিদ সংগে সংগে বেষ্টিত হলো। প্রথমে শিষ্টভাষায় আমন্ত্রণ হলো আত্মসমর্পণের জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট চোঙের ভিতর দিয়ে হেঁকে বললেন—"তোমাদের এ পাগলামির অর্থ কী? যদি কোনো সংগত নালিশ থাকে, তোমাদের কোনো মোড়ল এসে আমাকে জানাও। আমি তার প্রতিকার করব। অনর্থক যদি গোলমাল বাধাও রাজদ্রোহের অপরাধে ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে।"

এ আহ্বানের উত্তরে এল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। একশ পুলিশ সংগে সংগেই মারা পড়ল। আর কয়েকজন তীরের ঘায়ে আহত হলো। পুলিশ ফৌজ হটে এল তীরের পাল্লার বাইরে।

সাঁওতালেরা কিন্তু রাইফেলের পাল্লার বাইরে নয়। তবু পুলিশ চালাচ্ছে না রাইফেল। সুদৃঢ় অট্টালিকার প্রাচীর ভেদ করার ক্ষমতা রাইফেলের তো নেই! সাঁওতালেরা ভিতরে বসে আছে, প্রতি রন্ধ্রপথে তীর বাগিয়ে। অতএব পুলিশ অবরোধ করে বসে রইল মসজিদ।

চার দিন কাটল এইভাবে।

মসজিদে আশ্রয় নেবার আগে খাদ্যের সংস্থান করার সময় পায়নি সাঁওতালেরা। কাজেই অবরোধের শুরু থেকেই উপবাস চলছে তাদের। পাঁচ দিনের দিন ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে মসজিদ থেকে বেরুলো তারা বীরদর্পে। তীর নিক্ষেপ করতে করতেই বেরুলো। যদিও তীরের পাল্লার বাইরে রয়েছে শত্রু।

সাঁওতালেরা কিন্তু রাইফেলের পাল্লার ভিতরেই। এক ঝাঁক গুলি এলো। মারা পড়ল চারজন। তাদের মধ্যে জীতু ছোটকা একজন, আর একজন সামু।

তবু সাঁওতালেরা এগুচ্ছে। ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলিও আসছে। কত যে মারা গেল। পুলিশ সে তথ্য কোনোদিন প্রকাশ করেনি। খবরের কাগজে নিহতের সংখ্যা ঘোষিত হলো—সর্বপ্রথম গুলির বলি সেই চারজনই।

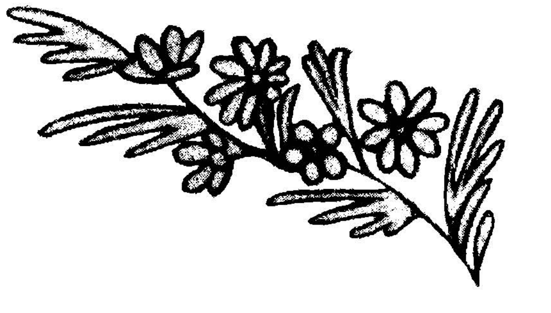

ছবি: দিলীপ দাস

সাহসী বলে বিজন আর অঞ্জনের নাম আছে, শুধু সাহসী নয়, দুঃসাহসী। পাড়াগাঁয়ে নির্জন শ্মশানে রাত কাটানো থেকে শুরু করে পোড়ো বাড়িতে রাত্রিবাস কিছুই ওদের বাদ যায়নি। ভয়ডর বলে কিছু ওদের অভিধানে নেই। ওরা বলে, ওটা হলো মনের দুর্বলতা, দুর্বল মানুষের বিলাস।

বিজনের বয়স বাইশ আর অঞ্জনের তেইশ। দুজনেই বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র, আসছে বছর ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। সব কিছুই ওরা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে। ভূতের প্রসংগ উঠলে হেসেই উড়িয়ে দেয়, বলে, যত সব গাঁজাখুরি গল্প। আমরা ভূতের দেখা পাবার আশায় যেখানেই খবর পেয়েছি ছুটে গিয়েছি, কই ভূত বাবাজী তো একবারও আমাদের দর্শন দিলেন না!

সেদিন ওরা কফি হাউসে কয়েকজন বন্ধুর সংগে আড্ডা মারছে, এক বন্ধু বলল শ্যামনগরে নাকি একটা ভূতের বাড়ি আছে। অনেকদিন আগে ওই বাড়িতে একজন আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল, তারপর থেকেই ভূতের উপদ্রবে সবাইকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এখন ওটা পোড়ো বাড়িই বলা চলে। ভয়ে কেউ সন্ধ্যের পর ও-বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষে না।

ওরা দু'বন্ধু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল, বিজন বলল, "ভূত আমাদের দেখা দেয় না, আমাদের ভয় পায়।"

অঞ্জন বলল, "এমন উড়ো খবর শুনে অনেকবারই ছুটে গেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমই হয়েছে, সবই ফাঁকা বুলি।"

যে খবরটা এনেছিল সে কিন্তু বলল শ্যামনগর হলো তার এক মেসোমশায়ের বাড়ি। অবিশ্যি আপন মেসোমশায় নয়। সেখানে একটা কাজে গিয়ে খবরটা সে শুনেছে। যিনি বলেছেন তিনি বাজে কথা বলার লোক নন। ওই বাড়িটার নাকি অনেকদিন ধরে দুর্নাম আছে। সাহস করে কেউ রাত কাটাতে পারে না। একবার দু'জন সাহসী তাই করতে গিয়ে ভিরমি খেয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বিজন আর অঞ্জন ঠিক করল শ্যামনগর যাবে, ব্যাপারটা দেখেই আসবে।

শনিবার পড়ন্ত বেলায় ওরা শ্যামনগর পৌঁছলো। বন্ধুর কাছ থেকে বাড়িটার সঠিক অবস্থান আগেই ওরা জেনে নিয়েছিল। স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, আবার লোকালয়ের একটু বাইরে। রাত কাটাতে হলে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার, খালি পেটে কি আর ভূতের মোলাকাৎ করা যায়, অবশ্য ভূত যদি সত্যিই থাকে।

ওরা একটা ঝোলার মধ্যে টিফিন ক্যারিয়ারে রুটি আর কষা মাংস নিয়ে গিয়েছিল, সংগে জলের বোতল আর ফ্লাস্কে চা। রাত জাগতে হলে চা না হলে চলে না। স্টেশন থেকে ওরা হাঁটা দিল। বাড়িটা খুঁজে পেতে ওদের কষ্ট হলো না। সত্যিই পোড়ো বাড়ি, অনেকটা জমি নিয়ে, আগাছা আর জংগলে ভরে গেছে সেই জমি। বাড়িটা দোতলা। চুন-বালি খসে ইঁটগুলো যেন দাঁত বের করে আছে, কার্নিশের এখানে ওখানে বট অশ্বত্থ গাছ গেড়ে বসেছে। আশেপাশে বাড়ি চোখে পড়ে না। বেশ গা ছম্-ছম্ করা পরিবেশ তাতে সন্দেহ নেই।

ওরা টর্চ আর এক প্যাকেট বড় মোমবাতি সংগে নিয়েছিল। তবে সেদিন ছিল পূর্ণিমা, অন্ধকারের ভয় নেই।

ওরা বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে এমন সময় একজন মাঝবয়সী মানুষকে ওদের দিকেই এগিয়ে আসতে দেখল। ওদের দেখে লোকটি থমকে দাঁড়াল, যেন অবাক হয়েই

জিগ্যেস করল, "এখানে কাকে খুঁজছেন ?"

বিজন হেসে জবাব দিল, "ভূত।"

"ভূত !" লোকটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল, বোধহয় ওদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল মনে।

"আসলে আমরা এ বাড়িটার কথা শুনে কলকাতা থেকে এসেছি," অঞ্জন এবার বলল, "এখানে নাকি ভূতের উপদ্রবে কেউ টিঁকতে পারে না, তাই নিজের চোখে দেখতে এসেছি।"

"আমাদের খুব ভূত দেখার শখ," বিজন কথার পিঠে যোগ করল, "অনেক পোড়ো বাড়িতেই আমরা রাত কাটিয়েছি, কিন্তু ভূতের দেখা পাইনি। ভূতই বোধহয় আমাদের ভয় পায়।"

"আপনাদের সাহস তো কম নয়," লোকটি এবার বলল, "এখানে রাত কাটাবার জন্য কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন ! এ বাড়ির সত্যিই দুর্নাম আছে, আপনারা ভাল কাজ করেননি।"

হো হো করে হেসে উঠল ওরা।

"বুঝেছি," লোকটি বলল, "আপনাদের খুব সাহস।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "যদি ভরসা দেন তো একটা কথা বলি।"

"বলেই ফেলুন," বিজন উৎসাহ দিয়ে বলল।

"মানে," লোকটি একটু ইতস্তত করে বলল, "আমারও খুব ভূত দেখার শখ, কিন্তু একা একা সাহস হয় না। তা আপনারা যখন এসেছেন.... মানে আপনারা যদি অনুমতি দেন তবে আমিও আপনাদের সঙ্গে এখানে রাত কাটাতে পারি।"

"সে তো ভাল কথা," অঞ্জন বলল, "আমাদের একজন সঙ্গী বাড়বে।"

লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "তা আপনাদের রাতের খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে ?"

"আমরা খাবার নিয়েই এসেছি," বিজন জবাব দিল।

"ও, একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন," লোকটি হাসল, "তবে আমি খেয়ে-দেয়েই আসব। আপনারা দোতলার মাঝখানের ঘরটায় থাকলেই ভাল করবেন, ওটাই একমাত্র রাত কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত। বলেন তো আমি একটা শতরঞ্জি কি মাদুর আনতে পারি।"

"তবে তো ভালই হয়," বিজন বলল, "ঘরটা নিশ্চয়ই খুব নোংরা হয়ে আছে।"

"তা আর বলতে," লোকটি জবাব দিল, "মানুষের বাস না থাকলে যেমন হয়। দাঁড়ান আমি একটা ঝাঁটা আনছি, আপনারা ততক্ষণ ঘরটা পরিষ্কার করুন।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লোকটি একটি ঝাঁটা নিয়ে ফিরে এল।

"সিঁড়ির ধাপগুলো আস্ত নেই, সাবধানে উঠবেন," লোকটি বলল, "নইলে পড়ে ঘাড় ভেঙে আপনারাও ভূত হয়ে যাবেন।" হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল লোকটি।

ওরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। লোকটি মিথ্যে ভয় দেখায়নি, সিঁড়িগুলো ভেঙে পড়েছে, যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। বাড়িটাও যে অনেক পুরনো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাঝখানের ঘরটাই ওরা বেছে নিল। অনেকদিনের ধুলো ময়লা জমেছে। ঘরটা ঝাঁট দিয়ে একটু ভদ্রস্থ করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

মাথার ওপর নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, স্নিগ্ধ সুধায় ঝলমল করছে চারদিক। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও বিজন একটু আধটু কাব্যচর্চা করে, মুখে মুখে ছন্দ মিলিয়ে কবিতা আওড়ায়। রুপোলি সন্ধ্যা ওর কাব্যিক মনে নাড়া দিল, আবৃত্তির সুরে ও বলে উঠল :

ওগো চাঁদ
পূরাও মনের সাধ–
ভূতের যেন দেখা পাই
ঘুমে যদি ওঠে হাই
আসে যদি অবসাদ
কোর না'ক বরবাদ
ভূত দেখা শুধু চাই–

"বাঃ ! বেড়ে কবিতা বানিয়েছেন তো," হঠাৎ অন্ধকার থেকে কার কণ্ঠস্বরে ভূত দেখার মতোই চমকে পেছন ফিরে তাকাল ওরা।

হাতটা ওদের দিকে বাড়িয়ে হিহি করে হাসছে তো হাসছেই।

তারপরই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সেই লোকটি, তার হাতে একটা আধময়লা শতরঞ্জি। বলল, "এর বেশি কিছু যোগাড় করতে পারলাম না।"

"ওতেই হয়ে যাবে," অঞ্জন বলল, "আপনি এর মধ্যেই খেয়ে এলেন?"

"হ্যাঁ, আমি কাছেই থাকি," লোকটি হাসল, "তাছাড়া আপনাদের সঙ্গে ভূত দেখার জন্য আমার মনটাও হা-পিত্যেশ করছিল, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।"

ওরা শতরঞ্জি বিছিয়ে বসল।

"আচ্ছা, ভূতের ব্যাপারটা কি বলুন তো?" বিজন লোকটিকে জিগ্যেস করল। "গল্পটা রটল কেমন করে? সত্যিই কি কেউ ভূত দেখেছে?"

"একটা কথা আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন," লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল, "আজকালকার দিনে এমন জমি-বাড়ি মিছিমিছি পড়ে থাকে কখনও? আসলে এই সম্পত্তি নিয়েই তিন ভায়ের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল, সে আজ বছর পঁচিশ তো হবেই। ছোট ভাই তেমন কাজ-কর্ম করত না, একটু উদাসী প্রকৃতির ছিল। তাকে ঠকিয়ে ওপরের দু'ভাই সব বিষয়-সম্পত্তি নিজেদের নামে করে নেবার মতলবে ছিল। সংসারে বিষয়ের মতো বিষ আর নেই, তার বীজ একবার মনে শেকড় গেঁথে বসলে তখন আর ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা থাকে না মানুষের, আপনজন হয়ে ওঠে পরম শত্রু। বড় ভাইদের আচরণে ছোট ভাই মনে এত দুঃখ পেয়েছিল যে, সে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই অবস্থায় যন্ত্রণায় সে সারা বাড়ি ছটফট করে বেড়িয়েছিল, আর অভিশাপ দিয়েছিল কেউ এই বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না। তারপর থেকেই শোনা যায় এ বাড়িতে তার আত্মা কায়েম হয়ে বসেছে, সবাইকে বাড়িছাড়া করেছে। বেঁচে থাকতে সম্পত্তির অধিকার সে পায়নি, কিন্তু মরে গিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে পুরো বাড়িটাই দখল করে আছে। কেমন মজার ব্যাপার বলুন তো।"

নিজের রসিকতায় লোকটি হি হি করে হেসে উঠল, আর তখুনি কাছ থেকে ভেসে এল একটা কুকুরের কান্নার শব্দ।

"ওই শুনুন," লোকটি বলল, "ওনারা ধারে কাছে রয়েছেন, কুকুর ঠিক টের পায়। আপনারা খেয়ে নিন, রাত করবেন না।"

ওরা খেতে বসে গেল। লোকটিকেও ওদের সঙ্গে বসতে বলেছিল, কিন্তু সে বলল তার পেটে আর জায়গা নেই।

তারপর শুরু হলো অপেক্ষা, ভূত দেখার অপেক্ষা। ওরা দু'বন্ধু তাস নিয়ে বসেছিল, সময় কাটাবার পক্ষে চমৎকার.... কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় টের পাওয়া যায় না।

রাত একটা....দুটো....তিনটে বেজে গেল। ওদের হাই উঠছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

"ধুত্তোরি," হাতের তাস ছুঁড়ে বিজন বলে উঠল, "এবারও পন্ডশ্রম, মিছিমিছি ছুটে এলাম।"

"তাই মনে হচ্ছে," অঞ্জন মুখ বাঁকাল, "লোকে গল্প বানাতে পারলে আর কিছু চায় না।"

শেষের কথাগুলো সেই লোকটিকে ঠেস দিয়ে বলা।

লোকটি কিন্তু বিদ্রূপ গায়ে মাখল না, বলল, "সত্যিই আপনাদের অনেক হয়রানি হলো, অনেক আশা করে এসেছিলেন।"

"আপনিই তো বললেন এ বাড়িতে ভূত আছে, লোকে দেখেছে," বিজন একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল, "চমৎকার একটা গল্পও শোনালেন, ভূত সবাইকে তাড়িয়ে সম্পত্তি ভোগ-দখল করছে।"

"তাই তো জানি," লোকটি অপরাধীর মতো মাথা চুলকাল।

"তবে কই সেই ভূত!" অঞ্জন প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, "খুব না বলছিলেন, এবার দেখান!"

"দেখবেন!" লোকটি আমতা আমতা করে বলল।

"কেন আপনি দেখাবেন?" বিজন ব্যঙ্গ করে বলে উঠল।

"মানে, আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন," লোকটি মিনমিন করে বলল, "আমাদের অতিথি, আপনাদের ভয় দেখানো কি উচিত!"

"আমরা অত ভয়-টয় পাই না," অঞ্জন গম্ভীর গলায় বলল, "তা যদি হত তবে এখানে ছুটে আসতাম না।"

"তা একশবার!" লোকটি ঘাড় দোলাল, "আপনাদের সাহস আছে স্বীকার করতেই হবে।"

"কই, ভূত দেখাবেন বললেন!" বিজন এবার হেসে উঠল।

"সত্যি দেখতে চান?" লোকটি সোজাসুজি বিজনের মুখের দিকে তাকাল।

"সত্যি না তো মিথ্যে নাকি!" অঞ্জন মুখ বাঁকাল, "যত সব ইয়ে...."

"তা ভূত আমি দেখাতে পারি, মানে এ বাড়ির ভূত," লোকটি যেন একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "কিন্তু সত্যি আপনারা ভয় পাবেন না তো?"

"ভয় আমাদের কুষ্ঠিতে লেখা নেই," বিজন একটু বাঁকা হাসি হাসল, "দেখান আপনার ভূত.... কোথায় যেতে হবে বলুন, আমরা রাজী আছি যেতে।"

লোকটি উঠে দাঁড়াল, বলল, "আপনারা আমাদের অতিথি, কিন্তু কি করব উপায় নেই...."

তারপরই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ওদের চোখের সামনেই লোকটির গায়ের মাংস যেন খসে খসে পড়তে লাগল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে দাঁড়িয়ে শুধু একটা নরকঙ্কাল.... ডান হাতটা ওদের দিকে বাড়িয়ে হি হি করে হাসছে তো হাসছেই।

অত বড় সাহসী দুই বন্ধুও মূর্ছা গেল।

ওদের যখন জ্ঞান হলো, ভোরের আলো ঘরে ঢুকেছে, ওরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই, এমন কি শতরঞ্জিটা পর্যন্ত নেই।

ছবি: রাহুল মজুমদার

মানুষ

প্রশান্ত চক্রবর্তী

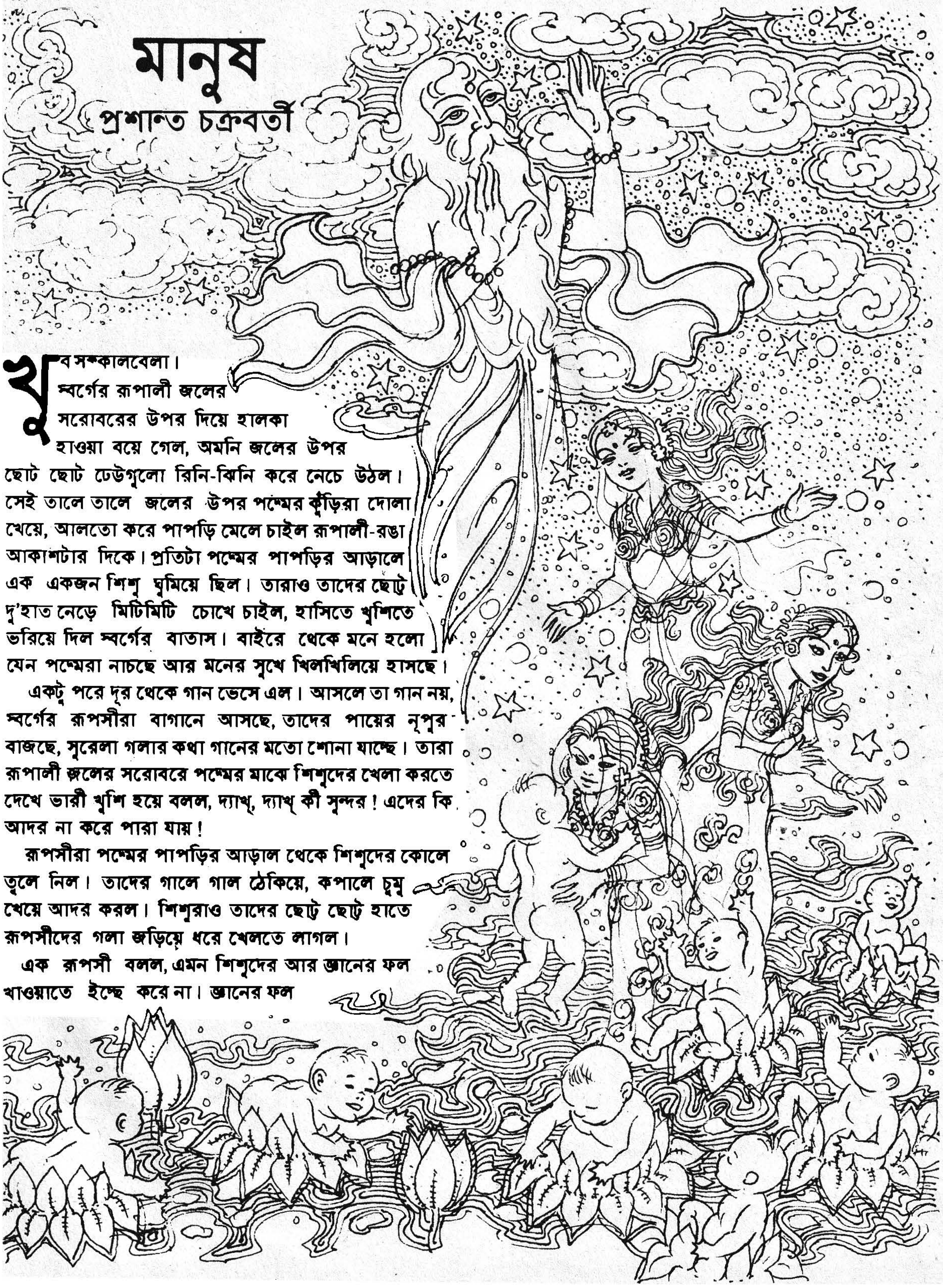

খুব সক্কালবেলা। স্বর্গের রূপালী জলের সরোবরের উপর দিয়ে হালকা হাওয়া বয়ে গেল, অমনি জলের উপর ছোট ছোট ঢেউগুলো রিনি-ঝিনি করে নেচে উঠল। সেই তালে তালে জলের উপর পদ্মের কুঁড়িরা দোলা খেয়ে, আলতো করে পাপড়ি মেলে চাইল রূপালী-রঙা আকাশটার দিকে। প্রতিটা পদ্মের পাপড়ির আড়ালে এক একজন শিশু ঘুমিয়ে ছিল। তারাও তাদের ছোট্ট দু'হাত নেড়ে মিটিমিটি চোখে চাইল, হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে দিল স্বর্গের বাতাস। বাইরে থেকে মনে হলো যেন পদ্মেরা নাচছে আর মনের সুখে খিলখিলিয়ে হাসছে।

একটু পরে দূর থেকে গান ভেসে এল। আসলে তা গান নয়, স্বর্গের রূপসীরা বাগানে আসছে, তাদের পায়ের নূপুর বাজছে, সুরেলা গলার কথা গানের মতো শোনা যাচ্ছে। তারা রূপালী জলের সরোবরে পদ্মের মাঝে শিশুদের খেলা করতে দেখে ভারী খুশি হয়ে বলল, দ্যাখ্, দ্যাখ্ কী সুন্দর! এদের কি আদর না করে পারা যায়!

রূপসীরা পদ্মের পাপড়ির আড়াল থেকে শিশুদের কোলে তুলে নিল। তাদের গালে গাল ঠেকিয়ে, কপালে চুমু খেয়ে আদর করল। শিশুরাও তাদের ছোট্ট ছোট্ট হাতে রূপসীদের গলা জড়িয়ে ধরে খেলতে লাগল।

এক রূপসী বলল, এমন শিশুদের আর জ্ঞানের ফল খাওয়াতে ইচ্ছে করে না। জ্ঞানের ফল

মেজাজ খারাপ বাব্লু সোনার
খেলা ছাড়া চলে না তার
কিন্তু, রোগের ছোঁয়াচ লাগে পাছে
সঙ্গীসাথী আসে না কাছে!
এমন সময় একো এলো
সাঁই ঝপাঝপ্ এঁকে চললো
১২-রঙে দেখা দিল ময়ূর, কুকুরছানা
বাব্লু আহ্লাদে আটখানা!
হলদে, কমলা, বেগুনী, কালো
গোলাপী, ভায়োলেট, খয়েরী, লাল ও
সবুজ, নীল—সব রঙ চাও
তো সেরা স্কেচ পেন একো-ই নাও!
EKCO
SKETCH PENS
একো
স্কেচ পেন সদা রঙীন সাথী! করে রঙ্গে মাতামাতি!
প্রিসিশন্ রাইটিং পয়েন্টস্ প্রাঃ লিঃ. ১৮. সুভাষ রোড. ভিলে পার্লে (পূর্ব) বম্বে-৪০০ ০৫৭ ফোন : ৬০৪০৩০৫, ৬০৪৩৫৫৬
nkaya-E-3-86-BEN

খাওয়ালেই তো বড়দের মতো বড় বড় কথা বলবে, আমাদের কাছে আর আসবে না।

কি আর করবি বল? অন্য রূপসীরা দুঃখ করল, বিধাতা-পুরুষের যে তাই-ই নির্দেশ।

এক বিরাট গাছ, মোটা মোটা শিকড় দেখলেই বোঝা যায় যে তার বয়েস অনেক হয়েছে। বিরাট বিরাট ডালপালা বিছিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বর্গের বাগানের ঠিক মাঝখানে। গা তার মুক্তোর তৈরি, ঝকঝকে। আর পাতাগুলোও ছোট ছোট মুক্তো বসানো। তাতে সূর্যের আলো পড়লে, ফুলঝুরির আলো ছড়িয়ে পড়ে। সারাক্ষণই আলো ছড়িয়ে পড়েছে গাছটা থেকে।

গাছে আঙুরের মতো থোকা থোকা ফল ধরে রয়েছে। ভারী সুস্বাদু। রূপসীরা হাত বাড়িয়ে সেই জ্ঞানের ফল পেড়ে খাইয়ে দিল শিশুদের! এতক্ষণ বেশ তারা পদ্মের উপরে শুয়ে খেলছিল। জ্ঞানের ফল খাবার পরই তারা খেলা বন্ধ করে ফুলের উপর উঠে বসল! তাদের চোখ-মুখের চাহনি গেল বদলে! দেখেই মনে হলো তারা এখন অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে! রূপসীরা আর তাদের আদর করল না। শুধু বলল, নতুন শিশুরা, তোমরা স্বর্গের শুভেচ্ছা নাও। এত দিন তোমরা স্বর্গের সরোবরে পদ্মের মাঝে ঘুমিয়ে ছিলে। এবার তোমাদের পৃথিবীতে যাবার সময় হয়েছে। তাই, বিধাতাপুরুষ তোমাদের কিছু উপদেশ দেবেন।

রূপসীরা নূপুরের রিনি-ঝিনি আওয়াজ তুলে চলে গেল স্বর্গের বাগান থেকে।

ফুলের গন্ধ নিয়ে হাওয়ায় লম্বা সাদা দাড়ি উড়িয়ে বিধাতাপুরুষ এলেন! বয়েস যে তাঁর কত কে জানে! তিনি শিশুদের বললেন, পৃথিবীতে এর আগে তোমরা অনেক ভালো কাজ করেছ, তাই তোমরা এখানে স্বর্গের সরোবরে পদ্মের পাপড়িতে ঘুমোতে পেয়েছ। পেয়েছ তোমরা সুখ, শান্তি, ভালোবাসা। তোমরা পারবে না তোমাদের শান্ত স্নিগ্ধ মনের আলোয় পৃথিবীর মানুষদের একটু সুখ দিতে? আনন্দ দিতে? পৃথিবীতে যারা ভালো কাজ করে তারাই ঐ বিশাল নীল আকাশে চিরকাল তারা হয়ে ফুটে থাকে। সেখান থেকে তারা তাদের স্নিগ্ধ আলোয় পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে দেয়।

বিধাতাপুরুষ তাঁর আঙুল তুলে দেখালেন আকাশে। শান্ত গলায় বললেন, ওই যারা ওখানে ধ্রুবতারা, কালপুরুষ তারা হয়ে ফুটে আছে তারা সবাই একদিন পৃথিবীর মানুষ ছিল। আজ তারা স্বর্গেরও অনেক উপরে স্থান পেয়েছে। আমার চেয়েও আজ তারা অনেক শক্তিমান।

স্বর্গের সরোবরে হাজার পদ্ম থেকে শিশুরা কলকলিয়ে উঠল, বিধাতাপুরুষ, আমরা এবার পৃথিবীতে যাব। আমরাও ঐ নীল আকাশে চিরকালের জন্য তারা হয়ে থাকতে চাই।

বিধাতাপুরুষ হাসলেন। সেই হাসি কত দুঃখের! তিনি বললেন, মানুষ সব সময়ই ভালো কিছু চায়। কিন্তু সেটা পাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার, তা তারা করে না।

হাজার পদ্ম আবার নেচে উঠল। শিশুরা গলা মিলিয়ে বলল, আমরা ভালো কাজ করব। আমাদের সাহায্য করুন।

বিধাতাপুরুষ আবার হাসলেন, বললেন, দিনের শেষে ফুলের মাঝে ঘুম পাড়িয়ে দেবে তোমাদের। যখন দূর তারার আলোয় স্বর্গের স্বপ্নের বাতাস বইবে, তখন সে বাতাস তোমাদের ছড়িয়ে দেবে পৃথিবীর দিকে। তোমরা গিয়ে জন্মাবে মায়েদের কোলে। আমি তোমাদের সংগে সব সময়ই থাকব। কখনও চোখের আড়ালে, কখনও বা সামনে।

আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক। শিশুরা তাদের হাজার হাজার হাত তুলে বিধাতাপুরুষকে বিদায় জানাল। নীল আর বেগুনী আলোয় স্বর্গের রাত হলো। ঘুমিয়ে পড়ল শিশুরা। স্বপ্ন বাতাসের পিঠে ফুলগুলিকে চাপিয়ে দিলেন বিধাতা। তারা উড়ে চলল পৃথিবীর দিকে।

ক'দিন পরে বিধাতাপুরুষ এলেন পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের দেখতে। তারা তো তাঁকে দেখে খুশিতে উচ্ছল। কিন্তু তাদের মায়েরা তো আর বিধাতাপুরুষকে দেখতে পেল না। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আপন মনে হাসতে খেলতে দেখে বলল, দ্যাখ, দ্যাখ আমার ছেলে আমার মেয়ে কেমন খেলছে!

এমনিভাবে অনেকদিন পেরিয়ে গেল, শিশুরাও বড় হয়ে উঠল। এখন আর বিধাতাপুরুষ আগের মতো তাদের সংগে খেলা করতে আসেন না। তিনি আড়াল থেকেই তাদের দেখেন। দেখেন যারা তাঁর কাছে কথা দিয়েছিল পৃথিবীতে ভালো কাজ করবে, এখন তারা সে সমস্ত ভুলে গিয়েছে। মন্দ কাজে তারা তাদেরই দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনছে। কষ্ট পাচ্ছে।

মানুষের দুঃখে বিধাতাপুরুষের দু'চোখ জলে ভরে যায়। তাঁর চোখের জল পৃথিবীতে পড়লে মানুষের দুঃখ-কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। তাই তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। হতাশায় তাঁর মন ভরে যায়। এ কি হলো? এই কি তবে সব কিছুর শেষ!

হঠাৎ বিধাতাপুরুষ দেখলেন, পৃথিবী থেকে এক আলোর বিন্দু স্বর্গের পথে ভেসে আসছে। কী তার রূপ! সে আলো এসে থামল স্বর্গের বাগানে। সেই আলোর বিন্দু থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। দু'চোখ তার উজ্জ্বল। রূপ আর কোমলতা মিশে তার মুখে এক অপূর্ব মাধুর্য। সে বিধাতাপুরুষকে প্রণাম করে বলল, আমি আপনার কথা রেখেছি।

বিধাতাপুরুষ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। তাঁর দু'চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন, তুমি আমার চেয়েও অনেক শক্তিমান। স্বর্গের চেয়েও সুন্দর ঐ আকাশে তারাদের মাঝে তুমি তোমার স্থান করে নিয়েছ।

সবাই আপনার জন্য—মানুষটি নম্র হয়ে বলল।

না, না—বললেন বিধাতা, তোমার কাজই তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি তোমার মতো হতো তবে পৃথিবীটা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর হতো। ঠিক ঐ নির্মল আকাশটার মতো।

ছবি: দিলীপ দাস

গড় চামুণ্ডেশ্বর

শিশিরকুমার মজুমদার

ভাঙা দেওয়াল আর ইঁট পাথরের স্তূপের মাঝ দিয়ে সরু পায়ে চলা পথটার শেষে যেখানে আমরা পৌঁছলাম, সেখানটাই গড় চামুণ্ডেশ্বরের সব থেকে ভাঙাচোরা এলাকা। ওখানে এক মিনিটও আমার থাকতে ইচ্ছা ছিল না। আর কিছু না হোক, যে কোনো ফাটলের মধ্যে থেকে যে কোনো মুহূর্তে সাক্ষাৎ মৃত্যু ফণা তুলে ফুঁসে উঠতে পারে। বিছা, বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সব চিন্তা কি হলধরবাবুর মনে আছে! পড়ন্ত বেলায় চারদিকের জঙ্গল হয়ে ওঠা বিশাল সব গাছপালায় পাখির চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। তারা সবাই ব্যস্ত অন্ধকার ঘনাবার আগে রাতের আশ্রয় ঠিক করে নিতে। হলধরবাবুর সে সব দিকে নজর নেই। কি এক চিন্তায় তিনি একদিকে এগিয়ে চলেছেন। আমাকে সঙ্গে থাকতে বলেছেন, কারণ কিছু তিনি আমাকে দেখাবেন। আর আজই একটা বিষয়ের শেষও করবেন উনি। ওঁর কথায় যেন কেমন রহস্যের আভাস পেয়েছি আমি। আসলে—এই প্রায়-ধ্বংস হয়ে আসা চামুণ্ডেশ্বরের গড় আমার মনে সব সময়েই একটা ভয়মেশানো রহস্যের আভাস আনে। ওঁর কথায় সেই রহস্য আরও গভীর হয়েছে।

সিংহ বংশের শেষ পুরুষ এই হলধর সিংহ। এককালে এই চামুণ্ডেশ্বর গড় ঘিরে তাঁদের রাজ্য ছিল। নবাবী আমলের শেষে ইংরাজ আমলেও তাঁরা ইংরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। তবে আর পাঁচটা রাজপরিবার যেভাবে প্রায় শেষ হয়ে গেছে ইংরাজ আমলেই, সেভাবেই এই সিংহ বংশও তাঁদের সব গৌরব হারিয়েছে। দেশ স্বাধীন হলে বাকি যা কিছু ছিল তাও গেছে। হলধর সিংহ-মশাই তবুও এই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই জীবন কাটাচ্ছেন!

আমাকে উনি অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনে মানুষ করেছেন। না, নিজের কাছে রেখে নয়। শহর কলকাতার হোস্টেলে থেকে আমি পড়াশুনা করেছি। কালেভদ্রে ছুটিতে আমি এসেছি চামুণ্ডেশ্বর গড়ে। বেশি দিন উনি আমাকে এখানে থাকতে দেননি। আর তার থেকেও বড় কথা, কখনও উনি আমাকে ওঁর খুব কাছের লোক হতে দেননি। আমি আজও ওঁকে হলধরবাবু বলে ডাকি। ডাকতে আমার খুবই লজ্জা করে, কিন্তু আমি নিরুপায়, ওর বেশি আর উনি এগোতেই দেন না!

স্কুল কলেজ জীবনে কখনও আমি কোনো অভাবে পড়িনি। পাস করে এই যে আমি সরকারী অফিসে এত ভাল কাজ করি, তার একটা পয়সাও তিনি কোনো ভাবে আমার কাছ থেকে নেন না। আমি যে সব কিছুতেই ওঁর থেকে অনেক দূরে সে বোধটা উনি আমাকে ভুলে যেতে দেননি।

আজ বহুদিন বাদে হঠাৎ ওঁর চিঠি পেয়েই এখানে এসেছি সব রহস্যের শেষ দেখতে বোধ হয়। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে।

আপন মনে কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় থামলেন

হলধরবাবু। কি যেন কিসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওই দেখ, ওই সামনে দ্বাদশ পাপীর পাষাণমূর্তি। না, না, আমি বলতে চাই, দ্বাদশতম পাপীর পাষাণমূর্তি। এর থেকে একাদশ পাপী তো কবেই মুক্তি পেয়েছেন। এদিকের সবাই বলে, ওই দ্বাদশতম পাপীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই চামুন্ডেশ্বর গড়ও পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দ্বাদশ পাপী মানে?

উনি আমার কথা শুনে হাসলেন, বললেন, মানে, বারজন পাপী, যাঁরা এক এক করে এই বংশে জন্মেছিলেন। তাঁরাই এক শিল্পীর হাতে বন্দী হয়ে পরপর ওখানে খাড়া হয়েছিলেন। একদিন একসঙ্গে এগারো জনের মুক্তি হয়েছিল। এই গড়েরও অনেকটাই সেদিন একসঙ্গে ভেঙে পড়েছিল। সেই এগারো জনের মুক্তি পাবার পরই গড়ের এই অবস্থা। দ্বাদশ জনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাকি সব কিছুও ভেঙে পড়বে।

অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে একটা খাড়া দেওয়ালের সামনে কাল গ্রানাইট পাথর কুঁদে তৈরি এক খাড়া পুরুষ মূর্তি. বলিষ্ঠ তার গড়ন, মুখ চোখ দেহের ভঙ্গিও নিখুঁত। আমার মনে হলো, ও কোনো পাপীর মূর্তি হতে পারে না, হলধরবাবু ভুল করছেন। ও নিশ্চয়ই কোনো হিন্দু দেবতার মূর্তি। উঁচু দেওয়ালের সামনে, বেদীতে দাঁড় করান আছে!

হলধরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওই সব পাপীদের কাহিনীই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের গোটা ইতিহাস। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে পরপর বারজন বংশধর সেই একই পথের পথিক ছিলেন। দুনিয়ার এ হেন কোনো পাপ ছিল না, যা তাঁরা করেননি! এমন কি ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ঠিক সময়মতো হাতও মিলিয়ে ছিলেন তাঁরা। তখনই রাজা উপাধি পেয়ে চামুন্ডেশ্বরের মন্দির মাঝে রেখে এই গড়ও বানান তাঁরা। গোটা অঞ্চলের রাজাই বনে বসেন তাঁরা!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই গড় কি তবে বেশি দিনের নয়?

না, তেমন কিছু পুরনো এটা নয়। বললেন হলধরবাবু, শোনা যায়, কয়েক শ' বছর অগে এক অখ্যাত গন্ডগ্রাম ছিল এই চামুন্ডেশ্বরতলা। বটগাছের তলায় পড়ে থাকা এক পাথরকে চামুন্ডেশ্বর বলে পূজা করত স্থানীয় লোকেরা। ভাগ্যের খোঁজে পশ্চিম থেকে বায়ুধর সিং এই মুলুকে আসেন। তাঁর দেহে বল ছিল, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি ছিল। সে লাঠি ওঁর হাতে চলত ভীষণভাবে। আর তাঁর ছিল প্রচন্ড লোভ, বড়লোক হবার। এদিকেই কোথাও এক ধনী পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁরা তীর্থ-পরিক্রমায় যচ্ছিলেন। বায়ুধরকে তাঁরা পাহারাদার রাখলেন। সেই তীর্থযাত্রীরা তীর্থে পৌঁছেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে বায়ুধর প্রচুর সোনাদানা, টাকা পয়সা নিয়ে এই চামুন্ডেশ্বর তলায় এসে হাজির হন। অল্প জায়গা জমি কিনে এখানেই পাকা আস্তানা গেড়ে বসেন। তারপর হাতের লাঠির জোরে অল্প কিছুদিনেই এই অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি করতেন উনি?

ডাকাতি। বললেন হলধরবাবু, সেই শুরু এই বংশের ইতিহাস! বায়ুধরের ছেলে গুণধর। গুণের সীমা ছিল না তাঁর। তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত কিনা জানা যায় না, তবে আশপাশের গ্রামের প্রজাদের বারবার নালিশে হঠাৎ ঘুম ভাঙল নবাবের ফৌজদারের। প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে চামুন্ডেশ্বর গড় মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য এলেন উনি। এসেই এখানে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। এই গড়ের কোথাও কোনো গোপন জায়গায় মাটির তলের কুঠুরীতে তাঁর আত্মা এখনও হয়ত গুমরে মরছে। ফৌজদার না থাকাতে সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। আর নবাববাহিনীকে ডেকে আনার জন্য আশপাশের দশ-বিশখানা গাঁয়ের চাষীদের বন্দী করে এনে চরম শাস্তি দিলেন গুণধর। সেই শাস্তিদান চলল মাসখানেক ধরে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হতভাগ্যদের করুণ আর্তনাদ বহুদূরের মানুষের প্রাণে আতঙ্ক জাগাত।

আমি বললাম, এসব কথা থাক। শুনতে আমার ভাল লাগছে না। আপনি যেন আমাকে কি দেখাবেন বলেছিলেন?

হ্যাঁ দেখাব। বললেন উনি, দেখার আগে এই কথাগুলো শুনে নাও। তাহলেই তো বুঝবে কি আমি তোমাকে দেখাতে চাই। গুণধরের ছেলে, দন্ডধর। তিনিই চামুন্ডেশ্বরের মন্দির বানান। তাঁর দন্ডের ভয়ে তামাম অঞ্চলের ছেলেমেয়ে বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান, সবাই ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে বেগার খেটে এক একখানা পাথর মন্দিরের গাঁথুনিতে বসায়। মন্দির তৈরি হলে দন্ডধর তাঁর গুরু তান্ত্রিকাচার্য মহাঘোরানন্দকে মন্দিরের পুরোহিত করেন। তিনিই প্রতিদিন রাত্রে মহাবলি দিয়ে ধুমধাম করে চামুন্ডেশ্বরের পূজা করতেন। তিনিই দন্ডধরকে তন্ত্রে দীক্ষা দেন। দন্ডধরের মোক্ষ লাভ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে গ্রাম ছেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে দলে দলে লোক পালাতে শুরু করে। চামুন্ডেশ্বরের মহাবলি হবার ইচ্ছা তাদের কারও ছিল না। গড়ের চারপাশ জনশূন্য হয়ে গেল!

দন্ডধরের ছেলে আয়ুধধর। তাঁর ছিল শিকারের শখ। গড়ের চারপাশের জঙ্গলে তখন পাওয়া যেত পাখি। বড়জোর বুনো হয়ে যাওয়া দু একটা পোষা শূয়োর। ও সব শিকারে শখ মিটবে কেন ওঁর। তিনি খাঁচায় বন্দী সুন্দরবনের বাঘ ধরে এনে ছেড়ে দিলেন গড়ের চারপাশে গজিয়ে ওঠা নতুন জঙ্গলে। একটা দুটো বাঘ নয়, বেশ কয়েকটা। সে সব বাঘ গড়ের উঁচু পাঁচিল টপকে গড়ের মধ্যে ঢুকতে পারত না, খিদের ঠেলায় জঙ্গল ছেড়ে গিয়ে ঢুকল আশপাশের গাঁয়ে। প্রথম প্রথম গরু ছাগল ধরে, একসময় সব কটাই মানুষখেকো হয়ে দাঁড়াল। আয়ুধধর ঢোল পিটিয়ে চারদিকে জানিয়ে দিলেন, যে ওঁর বাঘের গায়ে হাত তুলবে তার মুন্ডু উড়িয়ে দেবেন। এরপর আয়ুধধরের শিকার খেলা শুরু হলো। সে খেলার শেষ হলো আয়ুধধরের বাঘে খাওয়া আধখানা দেহ খুঁজে পাওয়ার পর।

এসব কথা আমার শুনতে মোটেও ভাল লাগছিল না। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, এদিকে তো এখন কোথাও বাঘ নেই। জঙ্গলই নেই তো বাঘ থাকবে কি করে?

সে সব বাঘ ইংরাজরা মেরে শেষ করিয়েছেন দেশী শিকারীদের বারুদ টোটা দিয়ে। বন্দুক হাতে সেই সব বাঘের পিঠেই পা রেখে বড় বড় ছবি আঁকিয়েছেন সারা দেশে পাঠাবার জন্য। ও কথা থাক। এই পর্যন্ত এই বংশের কাহিনী লোকমুখে ফিরত। পঞ্চম পুরুষ থেকে একাদশ পুরুষ পর্যন্তও ওই একই ইতিহাস, কম বেশী অত্যাচারে ভরা। তবে তা নিয়ে আর এদিকে কোনো লোককথা চালু নেই। মনে হয় পূর্বপুরুষের কীর্তিকে তাঁরা ম্লান করতে পারেননি। তা না পারলেও সিং বংশ ততদিনে সিংহ বংশ নাম নিয়েছে। আর সিংহ বিক্রমেই প্রজাদের উপরে অত্যাচার চালিয়ে গেছেন।

দ্বাদশ পুরুষ বুদ্ধিধর। সত্যিই তিনি বুদ্ধি ধরতেন খুব। তা নিয়ে তাঁর অসম্ভব অহঙ্কারও ছিল। দেশে ততদিনে কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বুদ্ধিধরের গড়ে সাহেব-সুবোদের আনাগোনা খানাপিনা আরম্ভ হয়েছে। চারদিক যখন নীলকরদের অত্যাচারে জ্বলছে, প্রজারা চোখের জল ফেলছে তখন গড়ের হলঘরে গান-বাজনার আসর বসেছে।

বুদ্ধিধরের খাস জমিতে নীলের চারা কখনও মাথা দোলাত না! এই সময়েই কোম্পানী বাহাদুরের দেশী সেপাইরা দেশ স্বাধীন করার জন্য বিদ্রোহ করল। লোকে বলে, কোম্পানী বাহাদুর হিন্দু মুসলমান সিপাইদের ধর্মনাশ করার চেষ্টা করেছিল বন্দুকের টোটায় গরু আর শূয়োরের চর্বি মিশিয়ে। আসলে তা নয়, অযোধ্যার নবাবকে ইংরাজরা যে হীন চক্রান্তে গদিছাড়া করল, তাদের সেই হীনতা দেখেই হিন্দু মুসলমান সবাই ক্ষেপে গেল। দিল্লীর বাদশাকে তারা শাহেনশা ঘোষণা করে যুদ্ধ শুরু করল। চারদিকে গুলিগোলা চলতে শুরু করল। কাপুরুষ ইংরাজগুলো পালিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। বুদ্ধিধর বেকায়দা দেখে কীর্তিগড়ের রাজার কাছে গোপনে দূত পাঠালেন। মুখে কাজে কথায় তিনি যতই না কেন ইংরাজদের পক্ষে থাকুন, আসলে তিনিও দিল্লীর বাদশার গোলাম। দিল্লী থেকে যে হুকুম আসবে তা তিনি তখুনি তালিম করবেন।

একথা বলে কি যেন ভাবলেন হলধরবাবু, তারপর বললেন, এসো, আরও কিছুটা আমরা এগিয়ে যাই। তাহলে দ্বাদশ মূর্তি তুমি ভাল করে দেখতে পাবে। কথার শেষে ভাঙা ইঁট পাথরের মাঝ দিয়েই উনি এগোলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও মূর্তিটা তাহলে কার?

উনি চলতে চলতেই উত্তর দিলেন, এই বংশের সেই কুখ্যাততম পুরুষ বুদ্ধিধরের মূর্তি ওটা। সেপাই যুদ্ধ শেষ হবার পর ইংলন্ডেশ্বরী ভারতের সম্রাজ্ঞী হন। তাঁর সরকার ওই বুদ্ধিধরকেই এই গোটা অঞ্চলের খাজনা আদায় তহসিলের ভার দেয়। ইংরাজ সরকারের কাছে তাঁর তখন কি খ্যাতি! ওঁর বুদ্ধিতেই কীর্তিগড়ের বিদ্রোহীদের খতম করা সম্ভব হয়েছিল।

আমি বললাম, সেকি, তিনি তো দিল্লীর বাদশার গোলাম হতে চেয়েছিলেন!

ওটাই ছিল ওঁর চাল। বললেন হলধরবাবু, ওই চালেই কীর্তিগড়ের সবাই ধরা পড়ল। তারপর বহু বছর কেটে গেল। যুদ্ধের কথা সবাই ভুলল। বুদ্ধিধর কীর্তিগড়ের বিখ্যাত শিল্পী নীলরতনকে বহু টাকা দিয়ে এখানে আনলেন। ইচ্ছা তাঁর, পূর্বপুরুষদের মূর্তির সঙ্গে নিজেরও একটা মূর্তি গড়া। এত বড় বংশের বিখ্যাত সব পুরুষদের কারও কোনো স্মৃতিচিহ্ন থাকবে না, তা তো হতে পারে না। রাজী হলেন নীলরতন মূর্তি গড়তে।

কথা বলতে বলতে শেষ মূর্তিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হলধরবাবু। কি যেন খুব ভাল করে দেখলেন মূর্তিটার মধ্যে। কেমন যেন করুণভাবে হাসলেন একটু। বললেন, এগিয়ে এসো আরও। অতদূর থেকে এই মূর্তির সূক্ষ্ম কাজ বুঝতে পারবে না। নীলরতন ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

দূর থেকে আমার কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল ও মূর্তি অপূর্বসুন্দর কোনো দেবতার মূর্তি। কিছুটা কাছে গিয়ে আমি মুখ তুলে তাকালাম মূর্তির মুখের দিকে। তাকিয়েই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলাম। আমার মুখ দিয়ে অজান্তে একটা চাপা আর্তনাদ বার হলো। অপূর্বসুন্দর কোনো দেবতার মূর্তির মুখে চোখে একি পৈশাচিক চাহনি! আর সেই চাহনি কী ভয়ঙ্কর প্রাণবন্ত!

শান্তভাবে হলধরবাবু বললেন, ভয় পেও না, ভয় পেও না। ও হলো প্রাণহীন মূর্তির চাহনি। ও তোমার কোনোই ক্ষতি করবে না।

আমি বললাম, নীলরতন এমন মূর্তি গড়ল কেন?

নীলরতন এক শর্তে মূর্তি গড়তে রাজী হয়েছিলেন। ওঁকে নির্জনে একা কাজ করতে দিতে হবে পাঁচিল ঘেরা জায়গায়।

সেখানে কারও যাবার অধিকার থাকবে না। এমন কি কাজ কতদূর এগোলো সে খবরও কেউ নিতে পারবে না। এছাড়া ওঁকে ওঁর প্রয়োজনীয় সব কিছুই দিতে হবে নিয়মিত। সব কথাতেই রাজী হয়েছিলেন বুদ্ধিধর। এখানেই পাঁচিল ঘেরা জায়গা দিয়েছিলেন ওঁকে। কোনো অভাব রাখেননি ওঁর। আর অসীম ধৈর্য নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলেন তিনি। মূর্তি গড়া শেষ হলো একদিন। পাঁচিল ঘেরা জায়গার দরজা খুলে বার হয়ে এলেন নীলরতন। তাঁর চোখের কোণে কালি পড়েছে তখন। পিঠও কুঁজো হয়ে গেছে। মাথার চুলেও পাক ধরেছে। যে যুবক কাজে ঢুকেছিল, সেই অকালে বুড়ো হয়ে বার হয়ে এল প্রচন্ড পরিশ্রমের শেষে। কিন্তু তাঁর মুখে চোখে অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি। বাইরে এসেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার কাজ শেষ, তোমরা সবাই দেখে যাও কি নিঁখুত জিনিস আমি গড়েছি। এই সিংহ বংশের সত্যি পরিচয় আর পৃথিবীর কাছে অজানা থাকবে না।

বুদ্ধিধরের তখন অনেক বয়স। পাত্রমিত্র সভাসদ সবাইকে নিয়েই তিনি ঢুকলেন সেই চৌহদ্দির মধ্যে। নীলরতন সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখুন মহারাজ দেখুন, দেখুন, আপনার পূর্বপুরুষদের এত নিখুঁত মূর্তি আমি গড়েছি যে এক এক করে সবাইকেই আপনি চিনতে পারবেন। তাই যদি না করতে পারব তো কিসের আমি শিল্পী? মূর্তিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সবাই কিন্তু আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

আমি বললাম, তার মানে, ওগুলো তাহলে কিসের মূর্তি ছিল? হাসলেন উনি। বললেন, না, না, ওগুলো সবই মানুষের মূর্তি ছিল। যেমন এই দ্বাদশ মূর্তিখানা। তবে এখানকার মতোই অন্য আর সব মূর্তিগুলোও তাদের আপন আপন রূপ প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই অমন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল সবাই।

আমি বললাম, তারপর, তারপর কি হলো?

বুদ্ধিধর বেশ কিছুক্ষণ নিজের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, নীলরতন, একি ভুল করলে তুমি? অমন যার মুখের চেহারা, সে তো পশুর মতো হিংস্র হবে। হেসে নীলরতন বলেছিল, আপনি যে আপনাকে চিনতে পেরেছেন তাতেই বোঝা যায় আমি সার্থক। তবে মহারাজ, আমাকে আপনি ভাঙতে পারবেন, ওই মূর্তিগুলোকে নয়। ওরা যে সাক্ষী। হ্যাঁ, ভাঙবে ওগুলো যখন ভবিষ্যতের কেউ তাঁদের পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে আপন জীবন দিয়ে।

কথার শেষে আমার দিকে তাকিয়ে হলধরবাবু আবার সেই কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকলেন। আমার মনে কেন জানি না একটা ভয়ের অনুভূতি জাগল। চারদিকে ততক্ষণে বিকালের কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। আবছার মধ্যে মূর্তিটাকে এখন যেন একটা নরপিশাচের মূর্তি বলে মনে হতে লাগল। ওটা যেন এখুনি প্রাণ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকের রক্ত চোষার জন্য!

চাষীদের চরম শাস্তি দিলেন গুণধর

হলধরবাবু আপন মনেই যেন বললেন, বুদ্ধিধর ভীষণ ভুল করে ফেলেছিলেন। উনি জানতেন না, কীর্তিগড় রাজপরিবারের ছেলেই নীলরতন। ইংরাজরা তো ওঁরই বুদ্ধিতে কীর্তিগড় ধ্বংস করতে পেরেছিল। রাজপরিবারের সবাইকেই ইংরাজরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যের জোরে বেঁচেছিল ঐ নীলরতন।

ভয় ছাপিয়ে আমার মনে তখন একটু একটু করে কৌতূহল জাগতে আরম্ভ করেছে। দ্বাদশ মূর্তিটার আরও কাছে গিয়ে আমি দেখলাম। ইংরাজ রাজত্বে নীলরতন, সিংহ বংশের রক্তপাত ঘটিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারেনি বটে। তবে এমনি করে মূর্তি গড়ে সে চূড়ান্ত প্রতিশোধই নিয়েছিল। কিন্তু বাকি এগারোটা মূর্তি গেল কোথায়? জায়গাটা এককালে ঘেরা দালানের মতো ছিল। এখন দালানটা আছে, আর আছে পিছনের দেওয়ালটা। দালান জুড়ে পরপর সব ভাঙা পাথরের স্তূপ। ওখানেই তো মূর্তিগুলো থাকার কথা। আমি থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বললেন, নীলরতন বারটা মূর্তি গড়েছিল। এখানে তো একটা দেখছি, বাকিগুলো....?

আমার কথা শেষ হবার আগেই উনি বললেন, এগারো জনের শাপমুক্তি হয়ে গেছে। ওই তো ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছেন তাঁরা। মুক্তি হয়নি বুদ্ধিধরের। তাঁর মুক্তির জন্যই তো আজ তোমাকে ডেকেছি এখানে আমি।

আমি বললাম, তার মানে?

উনি বললেন, বুদ্ধিধর নীলরতনের দুচোখ উপড়ে নিয়ে জ্যান্ত তাঁকে পাঁচিলে গেঁথেছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই পাঁচিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হেসেছিলেন নীলরতন। সে হাসি শুনেই নাকি পাগল হয়ে গেছিলেন বুদ্ধিধর! তাঁর যে শেষ পর্যন্ত কি হয় তা কেউ জানে না। বুদ্ধিধরের ছেলে ইংরাজদের

কাছ থেকে কামান চেয়ে এনে গোপনে মূর্তিগুলো উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। মূর্তিগুলো ভাঙেনি। কামান দাগতে এসে সাহেব গোলন্দাজরা মূর্তিগুলো দেখে। ওদের কাছে ওগুলোর গঠন সৌন্দর্য এতই ভাল বলে মনে হয় যে কামান নিয়ে ওরা ফিরে যায়। ওদের মুখে মুখেই ওই মূর্তিগুলোর কথা সাহেবদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে একজন দুজন দেখতে আসে, ক্রমে ছুটিতে দল বেঁধে সাহেব মেমরা দেখতে আসতে লাগল। কাছের আমবাগানে তাদের পিকনিকের জায়গা হলো। সিংহবাড়ির বার দানবের কথা, তারপর ছড়িয়ে পড়ল সব দিকে। ওগুলোকে আর ভেঙে ফেলার সুযোগই রইল না। দলে দলে সাহেব মেমদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বুদ্ধিধরের ছেলেকেই ওই সাহেব মেমদের দেখাশুনা করতে হতো। তারা ওর পয়সায় খানাপিনা সেরে হাসিমুখে বলে যেত, দিজ সিনহা ডেভিলস আর রিয়েলি হরিবল! হি হু কার্ভড্ দেম ইজ এ মাস্টার স্কালপ্‌ট্যার। রাগে দুঃখে বুদ্ধিধরের ছেলে ছটফট করত।

আবার থামলেন হলধরবাবু। কিছুক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, আজ চতুর্দশী, শুনেছি এই চতুর্দশীর কোনো এক রাতেই বুদ্ধিধর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অমন ভয়ংকর মানুষটার আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। কেউ বলে তাঁকে প্রজারা গোপনে খুন করে। কেউ বলে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সে যাই হোক, আজ তোমাকে ডেকেছি, তোমাকে এ বাড়ির পূর্বপুরুষদের পাপে জমা গুপ্তধনের হদিস দেব বলে। যার খবর এই বংশের প্রধান পুরুষরা পরপর শুনে এলেও, ভয়ে তার দিকে হাত বাড়ায়নি এতকাল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনাদের বংশের গুপ্তধন

দেওয়ালের আড়ালে একটা ছোট কুঠুরি

আমি নেব কেন?

উনি বললেন, নীলরতনের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। এই পরিবারের পরবর্তী বহুজনের বহু সৎকাজেও ওই দ্বাদশ মূর্তি ভেঙে পড়েনি। বুদ্ধিধরের ছেলের পরে যারা এ বংশে এসেছিলেন, তাঁর প্রত্যেকেই বিদ্যাবুদ্ধিতে যেমন অনেক উঁচুতে ছিলেন, তেমনি দানে-ধ্যানেও ছিলেন দিকপাল।

বুদ্ধিধরের নাতির নাতি, শক্তিধর, এই অঞ্চল থেকে নীলকর সাহেবদের আপন শক্তিতে উৎখাত করেছিলেন। জনসন কোম্পানীর পাপের বাসা নীলকুঠি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। যে দিন তিনি মারা যান, ভীষণ শব্দে অভিশপ্ত মূর্তিগুলোর মধ্যে এগারোটাই পরপর একসঙ্গে ভেঙে পড়ে আপনা থেকেই। শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে এই দ্বাদশ ভয়ংকর মূর্তিটা, এই বংশের সব থেকে ভয়ংকর পুরুষের পাপের সাক্ষী হয়ে। কেউই পারেনি ওকে মুক্তি দিতে। হাসলেন হলধরবাবু। বললেন, আমি এই বংশের শেষ পুরুষ। তোমাকে আমি মানুষ করেছি শুধু ওই মূর্তিটাকে শাপমুক্ত করব বলে।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে সে কাজ আপনি করবেন?

আগের মতোই হাসতে হাসতে উনি বললেন, আছে, উপায় আছে। সেই জন্যই তো তোমাকে আজ ডেকেছি আমি। আজ আমি যা করব, কথা দাও, তা শেষ করবে তুমি। এই বংশের তুমি কেউ নও। এই বংশের পাপের শেষ হয়ে গেলে তার জের আর তোমাতে বর্তাবে না। এমনি কিছু করব বলেই তো সুলক্ষণ দেখে তোমাকে আমি অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনে মানুষ করেছি।

আমি ভীষণ ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আজ এ কি সব আবোল তাবোল কথা বলছেন হলধরবাবু। কি কাজ উনি রেখে যাবেন যা আমাকে শেষ করতে হবে! কি সে কাজ!

হলধরবাবু বললেন, অরুণ, আমি তোমার হাতে সেই গুপ্তভাণ্ডারের চাবি তুলে দেব। তুমি কথা দাও, এই গড়ের বুকে একটা বিশাল হাসপাতাল গড়বে। এমন হাসপাতাল, যা পৃথিবীর সেরা। যেখানে সবাই বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবে। থামলেন হলধরবাবু, কেমন করে যেন তাকালেন আমার দিকে। ওঁর চোখের সে দৃষ্টি আমার মনে ভীষণ ভয় ধরিয়ে দিল। আজ ওঁর এ কি হলো!

উনি বলেই চললেন, সেই হাসপাতাল ঘিরে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠবে বিশাল এক শহর। গড়ের ইঁট পাথর মাটি সরিয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠবে সে শহর। তার সঙ্গে এই সিংহ বংশের পাপের ইতিহাসও একটু একটু করে মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। তখন থাকবে শুধু আমার নাম। আর যেদিন আমার মূর্তির গলায় মালা পড়বে, জানি, ঠিক সেই দিনই ভেঙে পড়বে সব পাপের শেষ চিহ্ন ওই দ্বাদশ মূর্তিটা! সিংহ বংশের সব পাপের সেদিনই হবে শেষ। থামলেন তিনি।

আমি থাকতে না পেরে বললাম, এসব কি বলছেন আপনি! এ যুগে কি আর গুপ্তধন পাওয়া যায়। ভুলে যান ও সব কথা। মিথ্যা উত্তেজিত হবেন না।

ঠিকই বলছি আমি। উনি জোর দিয়ে বললেন, মনে রেখ, পাপের টাকা যদি তুমি অন্যভাবে খরচ কর, তাহলে তুমিও নিস্তার পাবে না। সিংহ বংশের সব পাপের বোঝাই তখন তোমার ঘাড়ে চাপবে। তুমি নরক যন্ত্রণায় জ্বলে মরবে। কথার শেষে শক্ত করে উনি আমার এক হাত ধরলেন। টলতে টলতে এগিয়ে চললেন বীভৎস সেই মূর্তিটার পিছন দিকে। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। বাধা না দিয়ে এগিয়েই চললাম। পিছনে দেওয়ালের আড়ালে একটা ছোট কুঠুরি। দরজা তার খোলা। আমাকে টেনে নিয়ে তিনি সেই ঘরের অন্ধকারের মাঝেই ঢুকলেন। অন্ধকার চোখে সরে যেতেই উনি দেওয়ালের গায়ের এক ফাটলে হাত রাখলেন। বোধ হয় বিশেষভাবে একটু চাপও দিলেন। বললেন, বুদ্ধিধরের পর আর কেউই এ ঘরে ঢোকেনি। জানি না কি আছে এর মধ্যে, তবে এ জানি, আছে সাত রাজার ধন। চোখ ধেঁধে যাবে তোমার।

ওঁর ধাক্কায় দেওয়াল নড়ল না। নড়বে কি, ও তো নিরেট পাথরে গাঁথা। ও কখনও নড়ে! বেশ বুঝতে পারলাম নানান চিন্তা ভাবনায় হলধরবাবুর মনের অবস্থা বোধ হয় ঠিক নেই। হয়ত উনি নিজের অজান্তেই আজও কি সব কথা ভাবছেন। অত টাকার কথা কি কেউ কখনও ভুলতে পারে। তবে যা কিছু ছিল, তা তো নিশ্চয়ই পূর্বপুরুষদের কেউ না কেউ ভোগ করে গেছেন। সব কিছু শেষ করে দিয়ে ওই গুপ্তধনের কথা রটনা করে গেছেন।

একি, দেওয়াল সরছে না কেন? চেঁচিয়ে উঠলেন হলধরবাবু, অরুণ এসো তো, হাত লাগাও। ঠিক এই জায়গাটাতে। ফাটলের বাঁ দিক থেকে তৃতীয়, আর উপরের কোণ থেকে নবম, হ্যাঁ, এই পাথরটায়। জোরসে ধরে টান।

একটা বিশ্রী আওয়াজ তুলে দেওয়ালটা যেন ধসে পড়ল আমাদের চারপাশে। বহু যুগের জমানো ধুলো উড়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। খক খক করে কাশতে আরম্ভ করলেন হলধরবাবু। কাশির মধ্যেই বললেন, দেখ, দেখ, কি আছে ভিতরে। অনেক অনেক হীরা জহরৎ টাকা পয়সা, নাকি সোনার বাট। যার লোভ এ বংশের অনেকেই জয় করে গেছেন। অরুণ তুমি কথা দাও, এ পয়সার তুমি সৎ ব্যবহার করবে।

আমি কোনো কিছু বলার আগেই বাইরেও কোথায় যেন ভীষণ শব্দ উঠল। বহুদিনের পুরানো কিছু যেন ভেঙে পড়ল। চারপাশের এই ভগ্নস্তূপের মাঝে তেমন কিছু হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সামনে আমি কি দেখব? ধুলোর মেঘ সরে গেলে।

ধুলোর মেঘ কাটল, আবছা অন্ধকারের মাঝে ক্রমে ক্রমে সব কিছু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আতঙ্কভরা চোখে আমি দেখলাম, কোথাও কিছু নেই। শুধু সামনের দেওয়ালের পাশে পড়ে আছে হলদে হয়ে যাওয়া একটা মানুষের কঙ্কাল। তাও লোহার শিকলে বাঁধা। মরচে ধরা শিকলের গাঁটগুলো ছড়িয়ে আছে হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। বীভৎস এই দৃশ্য অতীতের কোনো ভয়ঙ্কর শাস্তির সাক্ষী।

নজর আরও পরিষ্কার হলে দেখলাম, ঘরের দেওয়ালে ঘষে ঘষে হতভাগা কি যেন সব লিখে রেখে গেছে। সভয়ে কাছে গিয়ে পড়লাম, লেখা আছে, 'আমি বুদ্ধিধর, সারা জীবন নিজের বুদ্ধি নিয়ে গর্ব করেছি। আসলে আমি নির্বোধ। এখন তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

অনেকক্ষণ থমকে থেকে হলধরবাবু বললেন, আঃ, আমার মন থেকে অনেক বোঝা নেমে গেল। সোনাদানা না থাক এখানে, একজন মহাপাপীর আত্মোপলব্ধির কথা লেখা আছে এখানে। যে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যায় তার তো মুক্তি হয়ে যাবার কথা? কথার শেষে উনি আমার দিকে তাকালেন। ওর দুচোখে তখন কেমন যেন এক চাহনি। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাহলে ওই দ্বাদশ মূর্তিটা এখনও কেন অমনভাবে খাড়া আছে ওখানে? কথার শেষে প্রায় ছুটেই যেন ঘর থেকে ব্যর হয়ে গেলেন উনি। কি যেন ওঁর তখনি মনে পড়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকা কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি ভয়ঙ্কর পাপের কি ভীষণ পরিণতি! তখনি আমারও মনে পড়ল, হঠাৎ যেন বাইরে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শুনেছিলাম। সে শব্দ কিসের? হলধরবাবুর চিৎকার তখন শুনতে পেলাম। ভীষণ উত্তেজনায় আমার নাম ধরে বারবার ডাকছেন উনি।

ছুটে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ওঁর সামনে আর সেই দ্বাদশ মূর্তিটা নেই! সেখানে ভাঙা পাথরের স্তূপ। কাঁপা গলায় হলধরবাবু বললেন, আমার আত্মোৎসর্গ ছাড়াই এই অভিশপ্ত মূর্তিটা ধ্বংস হয়ে গেছে! তার মানে বংশপরম্পরায় বয়ে বেড়ান এক বীভৎস অভিশাপ থেকে আমি মুক্ত। বিশ্রী বিবেকযন্ত্রণা থেকেও আজ আমি মুক্তি পেলাম। চল, চলে যাই আমরা এই পাপপুরী ছেড়ে। লোকে তো বলেই, এই দ্বাদশ মূর্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই গড়ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হোক। চল, চল, আমরা আর কোথাও চলে যাই।

ছবি: রাহুল মজুমদার

নক্ষত্রেরা কতো দূরে

প্রবীরকুমার আদিত্য

একটা গাড়ি যদি ঘণ্টায় একশ কিলোমিটার বেগে ছোটে, তাহলে সূর্যের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রে যেতে তার কতো সময় লাগতে পারে? সময়ের অংকটা এতো বড়ো যে তা কল্পনা করতেও বেশ কষ্ট করতে হবে। হিসাব কষে দেখা যাবে, গাড়িটা চার কোটি আশী লক্ষ বছর পরে ঐ নক্ষত্রে পৌঁছুতে পারবে! এমনকি পৃথিবীর সব থেকে গতিশীল মহাকাশযান সেখানে যেতে সময় নেবে আশী হাজার বছর।

সুতরাং গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে হিসেব-নিকেশ কষতে গেলে, কিলোমিটার বা মাইল ইত্যাদি দূরত্বের এককগুলো ভীষণ ভীষণ নগণ্য হয়ে যায়। ফলে এই এককে দূরত্বগুলো এক বিরাট সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায়। নক্ষত্র তো দূরের কথা, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটাই দাঁড়ায় পনেরো কোটি কিলোমিটার। আর কাছের নক্ষত্রের দূরত্ব দাঁড়াবে ছশো কোটি কোটি কিলোমিটার (৬০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোমিটার) অর্থাৎ ছয়ের পাশে ষোলটা শূন্য বসাতে হবে। এই এতো বড়ো বড়ো সংখ্যা নিয়ে কি কাজ করা যায়, না মনে রাখা যায়! বিজ্ঞানীরা তখন সবাই ভাবতে বসলেন, তাই তো কি করা যায়। সুতরাং একটা বেশ বড়োসড়ো এককের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তখন তৈরি হলো এক নতুন একক, আলোকবর্ষ, অর্থাৎ কিনা আলো একবছরে যতো দূর যায়, সেই দূরত্বকে এক আলোকবর্ষ বলা হবে। আলো এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার যায়। সুতরাং আলো একবছরে নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি কিলোমিটার যাবে অথবা ষাট হাজার কোটি মাইল যাবে।

এই আলোকবর্ষের এককে আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরীর দূরত্ব হলো চার দশমিক তিন আলোকবর্ষ। উজ্জ্বল নক্ষত্র সিরীয়াস আছে আট দশমিক সাত আলোকবর্ষ দূরে। উজ্জ্বল রক্তিম নক্ষত্র বীটলজেন্স আছে ছশ পঞ্চান্ন আলোকবর্ষ দূরে। রাত্রির আকাশে আমরা যে সব নক্ষত্রদের খালি চোখে ঝিকমিক করতে দেখি, তারা সবাই দশ থেকে একশ আলোকবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। অবশ্য টেলিস্কোপের চোখে আরও অনেক অনেক দূরের নক্ষত্রদের দেখতে পাওয়া যায়।

মহাশূন্যে নক্ষত্রেরা বিভিন্ন জায়গায় সংঘবদ্ধ হয়ে বিচরণ করছে। আমাদের ঘরের নক্ষত্র–সূর্য এবং তার সংসার যে নক্ষত্রপুঞ্জে বা গ্যালাক্সিতে রয়েছে তাকে বলে ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। এখানে প্রায় কয়েক লক্ষ নক্ষত্র সংঘবদ্ধ হয়ে আছে, যাদের মধ্যে সূর্য হলো এক নগণ্য সদস্য! এই নক্ষত্রপুঞ্জ গোলাকার প্যাঁচালো চাকতির মতো। এর এক প্যাঁচালো বাহুতে রয়েছে সূর্য। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়া আরও কয়েক কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে এই মহাবিশ্বে। যাদের কেউ কেউ প্যাঁচানো, কেউ কেউ গোলাকার, আবার কেউ অনিয়তাকার। আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রপুঞ্জের নাম হলো অ্যান্ড্রোমেডা–এটিও প্যাঁচালো। ছায়াপথ থেকে এটি দুই দশমিক দুই পাঁচ আলোকবর্ষ (২.২৫ আলোকবর্ষ) দূরে অবস্থিত।

নক্ষত্রেরা কেউ কিন্তু স্থির হয়ে নেই। প্রায় সবাই প্রচণ্ড বেগে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে। সূর্যের কাছাকাছি নক্ষত্রেরা এবং সূর্য নিজেও প্রায় প্রতি ঘণ্টায় এক লক্ষ কিমি বেগে ছায়াপথকে পাক দিচ্ছে।

এই মহাশূন্যে কোথাও নবজাতক নক্ষত্র ঘন গ্যাস মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে–আস্তে আস্তে এই নবজাতকের ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা তেজে কেটে গেল গ্যাসের মেঘ। আবার

ছায়াপথের বয়স হলো প্রায় এক হাজার কোটি বছর

গ্যাসের ঘন মেঘ ও মহাশূন্যের সাপেক্ষে ধূলিকণাসম বস্তু

ভীষণ বেগে এই মেঘ এবং ধূলিকণারা নিজেদের দিকে এগিয়ে আসে

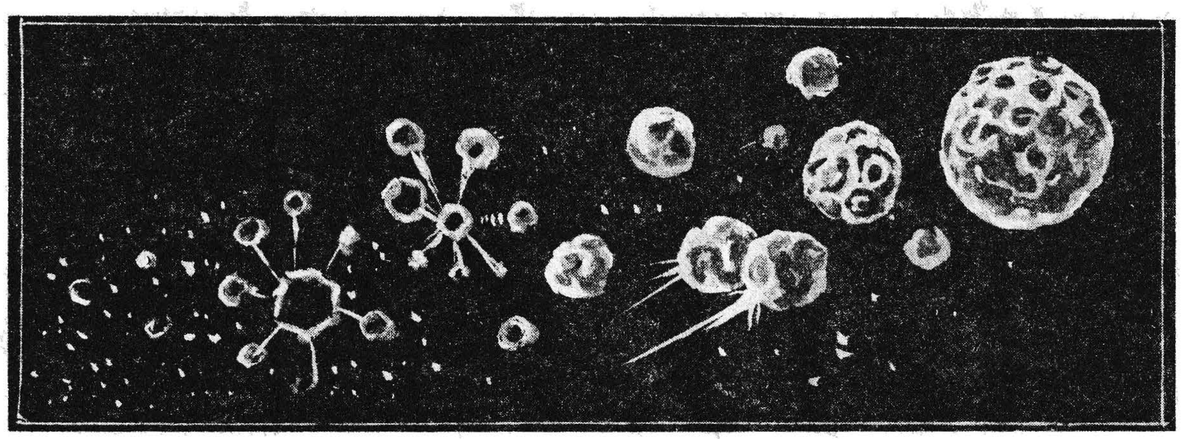

জন্ম হয় নতুন নক্ষত্রের

কোথাও বৃদ্ধ নক্ষত্রেরা প্রবল বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে ভীষণ সুন্দর ভয়ঙ্কর সুপারনোভাতে পরিণত হচ্ছে—লক্ষ লক্ষ সূর্যের সমান আলোতে চমকিত হচ্ছে চারধার।

পাঁচশ কোটি বছর আগেও আমাদের সৌরজগতের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ছায়াপথের বয়স হলো প্রায় এক হাজার কোটি বছর। এখানে বিভিন্ন বয়সের নক্ষত্রেরা সমবেত হয়ে আছে, আর আছে গ্যাসের ঘন মেঘ ও মহাশূন্যের সাপেক্ষে ধূলিকণাসম বস্তু। এরা অপেক্ষা করে আছে লক্ষ কোটি বছর ধরে, কবে নতুন নক্ষত্রের জন্মদান করার সুযোগ এরা পাবে। এইরকম গ্যাস এবং ধূলিকণারাই একদিন হঠাৎ সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, ঘটালো বিস্ফোরণ। কোনো বিশেষ কারণে ভীষণ বেগে এই মেঘ এবং ধূলিকণারা নিজেদের দিকে এগিয়ে আসে। তখন তাদের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রচন্ড বেড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় নিউক্লীয় বিক্রিয়া। জন্ম হয় নতুন নক্ষত্রের। আমাদের সৌরজগৎ গড়ে ওঠার সুযোগটা এসে গিয়েছিল ঐ গ্যাসের মেঘ এবং ধূলিকণাদের কাছে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে। চারশ পঞ্চান্ন কোটি বছর আগে এদের কাছাকাছি একটি নক্ষত্র হঠাৎ সুপারনোভাতে বিস্ফোরিত হলো। এর প্রবল ঝাপটা এসে লাগলো এই মেঘ এবং ধূলিকণাদের রাজ্যে। তারপর নানা বিবর্তনের পথ পেরিয়ে জন্ম নিলো আমাদের প্রিয় নক্ষত্র—সূর্য, তার সংসার এবং আমাদের সাধের বাসভূমি—পৃথিবী।

ছবি : সুফি

অবাক কান্ড

বিখ্যাত কুকুর

পৃথিবী-বিখ্যাত কুকুর হলো স্কাই টেরিয়ার ববি। স্কটিশ কৃষক অউন্ড জ্যাকের কাছে সে আসে একদম বাচ্চা অবস্থায়। জ্যাক মারা যান ১৮৫৮ সালে। তারপর থেকে টানা ১৪ বছর ববি তার মনিবের কবরের কাছে বসে থাকতো। দিনে একবার শুধু খেতে যেতো, তার মনিব যে রেস্তরাঁয় খেতেন, সেই রেস্তরাঁয়। এডিনবার্গের জনসাধারণ, ববি যাতে ঠান্ডায় কষ্ট না পায়, সেই জন্যে একটা আচ্ছাদন বানিয়ে দিয়েছিল। ১৮৭২ সালে ববি মারা যাবার পর তাকে জ্যাকের পাশেই কবর দেওয়া হয়।

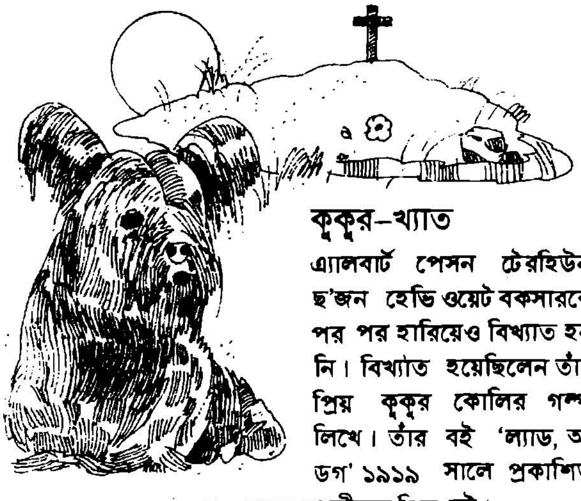

কুকুর—খ্যাত

এ্যালবার্ট পেসন টেরহিউন, ছ'জন হেভি ওয়েট বকসারকে পর পর হারিয়েও বিখ্যাত হন নি। বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কুকুর কোলির গল্প লিখে। তাঁর বই 'ল্যাড, আ ডগ' ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম, এবং এখনও কুকুর-প্রেমীদের প্রিয় বই।

লোভী বিচারক

নমিতা বসাক

বহুদিন পূর্বের কথা। এক গ্রামে এক জেলে বাস করত। সে একদিন একটি খাবারের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সে গরীব, তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাবারগুলো দেখছিল। এমন সময় খাবারের দোকানের মালিক তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই, তুমি কি দেখছ ?

জেলে থতমত খেয়ে উত্তর দিল, না–মানে...।

দোকানের মালিক এবার কর্কশ স্বরে বলল, মানে কি শুনি ?

খাবারগুলো দেখছিলাম আর কি।

মালিক বলল, দেখছিলাম মানে ? তুমি আমার সব খাবারের গন্ধ নিয়েছ। তোমাকে খাবারের অর্ধেক দাম দিতে হবে।

জেলে এই কথা শুনে হতভম্ব। কোনো রকমে মিনমিন করে বলল, এ আবার কি ধরনের কথা, শুধু শুধু আমার কাছে দাম চাইছ কেন, আমি তো তোমার খাবার খাইনি, শুধু দেখছিলাম।

ওসব কথা শুনব না, হয় তুমি দাম দাও, নইলে মামলা ঠুকব।

মামলার কথা শুনে জেলে আরও ঘাবড়ে গেল। এ আবার কোন ফ্যাসাদে পড়লাম রে বাবা। জেলে কাঁদতে কাঁদতে দোকানের মালিকের পা জড়িয়ে ধরে বলল, মাপ করে দিন বাবু, ভুল হয়ে গেছে। তাতেও কিন্তু দোকানের মালিকের মন এতটুকু গলল না।

খাবারের দোকানদার বেশ বড়লোক ছিল। তার এক ভাই শহরে পড়াশুনা করত। তার সঙ্গে শহরের বিচারকের খুব জানাশুনা ছিল। দোকানদার শহরে গিয়ে বিচারকের কাছে নালিশ জানাল। সঙ্গে বেশ কিছু উপহার দিয়ে বিচারককে খুশি করল। বিচারক তখন পেয়াদা দিয়ে জেলেকে হাজির হতে বললেন তাঁর কাছে।

জেলে তো প্রচন্ড ঘাবড়ে গেল। এখন কি করা যায়। এইসব চিন্তা করতে করতে সে শহরে গেল। যথাসময়ে সে বিচারকক্ষে হাজির হলো। দোকানদার তো শহরেই ছিল। সে আগেই বিচারকক্ষে প্রবেশ করে ভাই-এর সঙ্গে গল্প করছিল।

বিচারক একবার জেলেকে ক্রূর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন—তুমি দোকানদারের খাবারের গন্ধ নিয়েছ কেন বেকুব, পয়সা শোধ করে দাও, নইলে কঠিন সাজা হবে।

জেলে ভয়ে উত্তর দিতে পারল না।

বিচারক বললেন, দুদিন সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে যদি দাম শোধ না কর তাহলে তোমায় সাজা দেওয়া হবে। এই বলে বিচারক বিচারকক্ষ ত্যাগ করলেন। সঙ্গে দোকানদার ও দোকানদারের ভাই।

মাথা হেঁট করে জেলে বিচারকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় কে যেন তাকে পেছন থেকে ডাকল। জেলে পিছন ফিরে তাকাতে একটি লোক তাকে বলল, ঘটনাটা আমায় বলবে? জেলে তখন সব ঘটনা খুলে বলল। শুনে লোকটি বলল, তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি কাল বিচারকক্ষে তোমার সঙ্গে যাব, তোমার হয়ে আমি চেষ্টা করব আপ্রাণ। এবার জেলে তার হাত ধরে কেঁদে ফেলল আর বারবার বলতে লাগল, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

দুদিন পর যথাসময়ে সবাই বিচারকক্ষে হাজির হলো। বিচারক বললেন, কিহে জেলে, পয়সা এনেছ?

জেলে কথা বলার আগেই সেই লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ হুজুর, জেলের হয়ে আমিই পয়সা দিচ্ছি।

বিচারক মুখে হাসি এনে বললেন, তবে মিছিমিছি দেরি করছ কেন, দিয়ে দাও দোকানদারকে।

লোকটা জামার পকেট থেকে এক থলি সোনার মোহর বের করে দোকানদারের সামনে হাজির হলো। লোভী দোকানদার সেটা নিতে গেল।

লোকটা বলল, একটু অপেক্ষা করুন। এই বলে পয়সার থলিটা দোকানদারের কানের কাছে নাড়তে থাকে। তারপর দোকানদারকে উদ্দেশ করে বলে, শুনতে পাচ্ছেন?

দোকানদার উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ব্যস, তাহলেই ল্যাটা চুকে গেল। লোকটি বলল, জেলে আপনার দোকানের খাবারের গন্ধ নিয়েছিল, আর আপনি আমার পয়সার থলির আওয়াজ শুনলেন! হিসাব শোধ হয়ে গেল।

বিচারক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, রসিকতার জায়গা পাওনি?

লোকটি জবাব দিল, হুজুর, গন্ধ নিলে যদি খাওয়া হয় তাহলে পয়সার শব্দ শুনলে পয়সা নেওয়া হবে না কেন? আপনিই বলুন মহামান্য হুজুর।

বিচারকক্ষ চুপ হয়ে গেল। তখন সেই লোকটি বলল, শুনুন আমার পরিচয়, আমি রাজধানী থেকে এসেছি রাজার আদেশে, দেশের সবাই নিরপেক্ষ বিচার পায় কিনা দেখার জন্য। আমি রাজধানীর প্রধান বিচারক।

বিচারক তখন তাঁর আসন থেকে নেমে আগন্তুক সেই প্রধান বিচারকের পা জড়িয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, কিন্তু তাতে তাঁকে টলানো গেল না।

সাজা হলো লোভী বিচারকের আর সেই লোভী দোকানদারের।

জেলে পেল রাজার কাছ থেকে কিছু অর্থসাহায্য। তাই দিয়ে সে নতুন করে শুরু করল তার মাছের ব্যবসা।

*প্রচলিত লোককথা থেকে

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

জানো কী

- সিকান্দার বেগের প্রতিকৃতি কেউ আঁকতে পারতো না কেন?
- কোন পাখিরা উড়তে পারে না?
- দারুণ সব শাকসব্জী পেয়েও কেউ তা খেতে রাজী হলেন না কেন?
- ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়ে ব্রুস লি কী করলেন?
- প্রাচীন যুগে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কে প্রথম ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার চৈত্র সংখ্যায়, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু।

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর.....র...
কোনো রকমে লেসারটা যদি হাতে পাই.....
কিন্তু.....
সকলে মিলে রাইফেলটা তুলে ধরো.....
গর... র...র...র!
বিবিবিবিকিউরা লেসার রাইফেলটা তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু...
ব্যারেলটা তোল!
পারছি না, বড্ড ভারী!
এইটাতে চাপ দিলেই গুলি ছুটবে!
কিন্তু আমরা যদি মিস করি...
...আর যদি ক্যাপ্টেনের গায়ে গুলি লাগে?
আঃ...আঃ...আঃ...
সত্যিই চিন্তার কথা! আমাদের লক্ষ্য ঠিক না হলে গুলি ক্যাপ্টেনের গায়ে লাগতে পারে.....
কিন্তু উপায় নেই..... চালাও গুলি.....
DIVONO-HARRIS-NIVEN

[চলবে]

যাদুর দেশে টারজান

সব্যসাচী

টারজানের দৃষ্টি সন্ধ্যা থেকেই নিবন্ধ রয়েছে একটা জিনিসের উপরে। সে একটা বৃহৎ সুডৌল প্রস্তরখন্ড। তা থেকে অত্যুজ্জ্বল সবুজ দ্যুতি বেরুচ্ছে স্থির বিদ্যুতের মতো।

এ-বস্তু তো টারজানের ভাল রকম চেনা। এ ভাল্লার সেই সবুজমণি। তবে কথা এই, সবুজমণি দু'টো ছিল, একটা বহু শতাব্দীর পুরোনো, দৈবশক্তিসম্পন্ন, অন্যটা ভালকুভামের কারিগরি এলেমের চূড়ান্ত নিদর্শন। সর্ববিধ শক্তিবর্জিত। সে-দু'টির মধ্যে এটা কোন্‌টা?

সর্দার সেই সন্ধ্যা থেকে বসে আছে একটা টুলের উপরে। তার পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে মণিটা। কেউ ওটাকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। ওর সম্বন্ধে উপস্থিত নারী পুরুষদের উদাসীন ভাব দেখে টারজানের স্বভাবতই মনে হচ্ছে, ওর যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে, বা দামও আছে এক কানা-কড়ি, তা ওরা মনে করে না।

টারজানেরও সন্দেহ, শক্তি বা দাম কিছুই নেই এই পাথরের। অর্থাৎ ওটা সেই নকল মণিটা। নকল বলে বুঝতে পেরেই আলবুর্জ-রীকিরা ওটা ফেলে রেখেছিল তাদের ছাউনির একপাশে, এই বোকা ছানছানু সর্দার এর উজ্জ্বলতা দেখে নিয়ে এসেছে কাঁধে বয়ে। আনার পরে, দিনে দিনে ওর নতুনত্ব উবে গিয়েছে, অনাদরে পড়ে আছে খোলা আঙিনায়।

কিন্তু এ তো একটা ধারণা মাত্র। এ-ধারণা যে অকাট্য সত্য, এমনটা কেমন করে মনে করে টারজান? যদিস্যাৎ দৈবাৎ এটাই হয় আসল সবুজমণি?

এ-ব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় না হয়ে তো টারজান এ-স্থান ত্যাগ করতে পারে না। আসল না নকল? এ-প্রশ্নের উত্তরের উপরে নির্ভর করবে অনেক কিছু।

রাত দুপুর হয়ে গেল। আকাশ পৃথিবী তেমনি অন্ধকার। কেবল অগ্নিকুন্ডগুলো থেকে আলো গিয়ে আছড়ে পড়ছে মণির উপরে, সেটা ঝকমক করছে টারজানের চোখ ধাঁধিয়ে। টারজান গাছের ডাল থেকে চিতার মতো নিঃশব্দে নেমে পড়ল ভিতরের আঙিনায়। বেড়ার কোলে কোলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল মণির দিকে। কারও ঘুম ভাঙল না। টারজান গিয়ে মণি তুলে নিল, সন্তর্পণে আঙিনার দরোজা দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। আর তারপরে, মণি হাতে করে মৃদুস্বরে আদেশ করল—"ছানছানু সর্দার, তুমি উঠে বাইরে এস। আমার সঙ্গে চলে এস জঙ্গলে। এস, এস, এস!"

এই তো চরম পরীক্ষা। মণি যদি আসল সবুজমণিই হয়, তা স্পর্শ করে টারজান যে-আদেশ করেছে, সর্দারকে তা হবেই মানতে। দেখাই যাক—

আর দেখতে হলো না। সর্দার উঠে আসছে। ঘুমের ঘোরেই হেঁটে আসছে টারজানের পানে। বেরিয়ে এল দরোজা দিয়ে। দুইজনে চলে যাচ্ছে দূরে, নির্জন স্থানে। আগে আগে মণি-হাতে টারজান। পিছনে পিছনে আধ-বোজা চোখে ছানছানু সর্দার।

পরীক্ষা সফল। এই মণিই ভান্লার আসল সবুজমণি। ঠিক এরই মতো আর একটা মণি ধারে কাছেই আছে নিশ্চয়। আলবুর্জ-রীকির কাছেও থাকতে পারে, পারে অন্য কোনো অনধিকারীর কাছেও। যেখানেই তা থাকুক, সেটা যে নকল, তাতে কোনো সন্দেহ আর থাকতে পারে না। তার শক্তি বলতে কিছু নেই, না লৌকিক, না অলৌকিক।

মণি স্পর্শ করে ঘুমন্ত ছানছানু সর্দারকে উঠে আসতে আদেশ করেছিল টারজান। সর্দার সে-আদেশ অমান্য করতে পারেনি। উঠে এসেছে ঠিকই, দাঁড়িয়ে আছে টারজানের সমুখে বলির পশুর মতো। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে। নেংটি-পরা নিশীথ রাতের এই আগন্তুক যে দানো বা পিশাচ না হয়ে যায় না, এমনিই দৃঢ় ধারণা সর্দারের।

লোকালয় থেকে বেশ দূরে, অরণ্যের কোল-ঘেঁষা এক জায়গায় টারজান দাঁড়ালো সর্দারের মুখোমুখি—"কোনো গোলমাল যদি কর, তোমায় খতম করে দেব একেবারে", বলল টারজান।

"কে তুমি? কী চাও তুমি?" কাঁপা গলায় জানতে চাইল সর্দার।

"আমি দানোদের দেবতা। আমি চাই এই কথাটি জানতে যে দুটো পুরুষ, একটা আওরৎ, মোট তিনটে টারমাঙ্গানি গেল কোথায়?"

"সাদা আওরৎ তো আমি দেখিনি দানোর দেবতা!"

"মিছে কথা বোলো না। সেই আওরতের কাছ থেকেই তো তুমি এই সবুজ পাথর পেয়েছ?"—এটা টারজানের আন্দাজ শুধু।

"পাথরটা ছিল সাদা পুরুষদের কাছে। সিংহ দেখে যখন ভয়ে পালালো তারা, তাড়াতাড়িতে ফেলে গেল এটা। ছেলেরা এটা নিয়ে খেলা করবে বলে আমি নিয়ে এসেছিলাম। হ্যাঁ, শুধুই দুটো পুরুষ, মেয়ে একজনও ছিল না সেই সাফারিতে। সে কত সূয্যি আগে, জানতে চাইছ? সূয্যি তারপর থেকে ততবার বিছানা থেকে উঠেছে, যত আঙ্গুল আছে আমার দুই হাতে আর এক পায়ে।"

"তারা সিংহ দেখে পালালো? তুমি সেখানে করছিলে কী?"

"আমরা ঘুরতে ঘুরতে তাদের ছাউনিতে গিয়ে পড়েছিলাম। একটা সিংহ এসে লাফিয়ে পড়ল সেই সময়। সাদারা চম্পট দিল, ঐ পাথরখানা পিছনে ফেলে। আমি নিয়ে এলাম।"

"সাদা দু'জন কোন্ পথে গেল?"

ক্রাইম সিরিজ

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বই। শার্লক হোমসের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জেমস বণ্ডের মতো লড়িয়েদের নিয়ে একটির পর একটি মোট ষোলটি বই বেরিয়েছে। যে কোনো গোয়েন্দা উপন্যাসও হার মানবে এর কাছে। উত্তেজনায় টানটান, রোমাঞ্চে ভরপুর সব কাণ্ডকারখানা। লিখেছেন—

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

বার বার পড়ার এবং প্রিয়জনকে উপহার দেবার মতো ষোলটি বই দাম মাত্র সাত টাকা করে।

বুলেটের শিস্
উজ্জ্বল নীল মৃত্যু
উড়ন্ত বাজ
জ্বলন্ত আগুন
অদৃশ্য কালো হাত
মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর
শকুনেরা ওৎ পেতে
রুপোলী বিছের কামড়
প্রবাল দ্বীপের বিভীষিকা

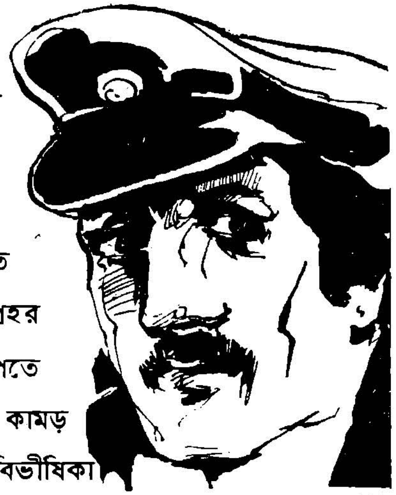

নরহত্যা
গুপ্তহত্যা
রাত্রির কালো দূত
নিয়ত বিপন্ন মৃত্যু
হাঙরেরা রক্তমাখা ঠোঁটে
কালো কালো শিকারী বেড়াল
ও একুশ নম্বর বাংলো

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

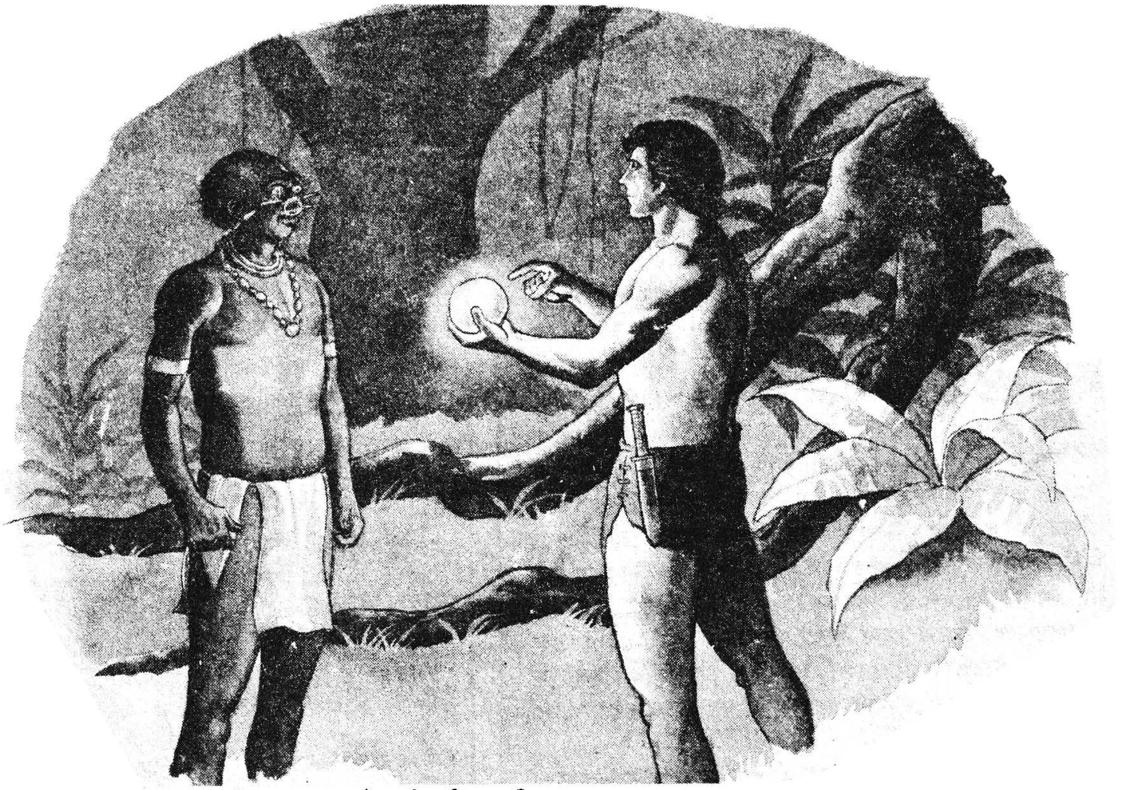

এই সবুজ পাথরটা তুমি চুরি করেছিলে সাদাদের কাছ থেকে?

"গেল? কোন্ দিকে গেল, তা বলতে পারব না। তারা এসেছিল উত্তর থেকে। পালালো পশ্চিমের জঙ্গলে। তারপর তাদের আর দেখিনি। আমি ব্যস্ত ছিলাম নিজের বিপদ নিয়ে। সিংহটা সাদার দলের কিছু করেনি। আমারই দুটো লোককে করেছিল খতম, জখমও করেছিল কয়েকটাকে।"

"সাদাদের সাফারিতে লোক ছিল কয়জন?"

"মোটে ছয়জন। খুব গরিবানা সাফারি। না ছিল তাদের খাবার, না ছিল বন্দুক। খুবই গরিবানা।"–কথায় অপরিসীম তাচ্ছিল্য সর্দারের। তারপরই সে অনুনয় করতে লাগল, "আমি যা জানি, তা তোমায় বলেছি। এইবার তুমি যাও।"

"এই সবুজ পাথরটা তুমি চুরি করেছিলে সাদাদের কাছ থেকে?"

"না, না। তারা পালিয়ে গেল ওটা ফেলে। আমি নিয়ে এলাম। এতে কি চুরি হলো? পাথর আরও একটা ছিল তাদের। এইরকমই। সেটা তারা নিয়ে গেল।"

এই দুপুর রাতের অস্বাভাবিক সাক্ষাৎকারে রীতিমত বিপন্ন মনে করলেও ছানছান্ সর্দার একটু না হেসে পারল না এইবার–"ওরা বড়াই করছিল। সেই অন্য পাথরখানা নাকি মস্ত দাওয়াই। বলছিল সেই পাথরই তাড়িয়ে দেবে আমার জোয়ানদের। কিন্তু কাজের বেলায় সে-সব কিছুই হলো না। পাথর আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।"

আঁধারে আঁধারে টারজান খানিকটা হেসে নিল। সে-পাথরটা যে নকল মণিটাই, তার আরও প্রমাণ একটা। শেষ প্রশ্ন সে করল–"কোনো সাদা আওরৎ তা হলে তোমার দেশে আসেনি ইদানীং? মিথ্যে বললে আমি জানতে পারব। মেরে ফেলব একেবারে।"

"না, না, এদেশে আসেনি কোনো সাদা মেয়ে।"

টারজান সাহসী তো বটেই। দু:সাহসীও তাকে বলা যায়। কিন্তু হঠকারী তাকে কেউ বলতে পারবে না। গভীর রাত্রি, নিবিড় অরণ্য, সিংহ গর্জাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায়, এ-অবস্থায় বনের মাটিতে পা দিলে সেটা নিছক হঠকারিতাই হত। হয়ত সিংহ-টারজানের লড়াইয়ে মারা পড়ত সিংহটাই, এমন তো বহুবারই মরেছে, কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে টারজানেরও অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাহলে শখ করে কেন একটা মারাত্মক অথচ অনাবশ্যক শক্তিপরীক্ষায় জড়িয়ে পড়া?

রাত্রিটা অতএব বৃক্ষশাখাতেই কাটিয়ে দিল টারজান। ন্যুমা মহারাজ অন্তত: দশবার দেখা দিয়ে গেলেন সেই একটি বিশেষ গাছতলায়, রাত্রির অবশিষ্ট এক প্রহরের মধ্যেই। কিন্তু বৃথা তাঁর অধ্যবসায়। টারমাঙ্গানিটা তাঁর লম্ফঝম্পকে তুচ্ছ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলো ঊর্ধ্বস্তরের একটা তে-ডালায়।

নিবিড় অরণ্য। বেলা যতই বাড়ুক, আলো তার ভিতর স্পষ্ট হয়ে ফোটে না। আলোর জন্য অপেক্ষা করে বসেও থাকে না আরণ্য জীবেরা। তা টারজানকেও তো সময়বিশেষে আরণ্য জীবই বলা চলে! সেই বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে, যখন সে একদম ভুলে যায় যে গ্রেস্টোফ আর্লদের বত্রিশ পুরুষের রক্ত তারই শিরায় শিরায় খরবেগে বইছে।

না, আলো ভালো করে ফুটুক। এ-প্রত্যাশায় টারজান তরুশাখার রাজশয্যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা মিনিটও কাটাতে রাজী নয়। বনতলে একটু আবছা আলোর ছোঁয়া লাগতেই সে নেমে পড়ল গাছ থেকে। আরণ্যশূন্য পথে পর্যটনের অনুকূল বটে এই অরণ্য খণ্ডটা, গায়ে গায়ে বড় গাছই অসংখ্য এখানে, কিন্তু সে-পথে যাত্রা করার এখন আছে ব্যক্তিগত অসুবিধা। গাছ থেকে গাছে লাফাতে হলে হাত দু'খানা তো মুক্ত থাকা দরকার অন্ততঃ। তা বর্তমানে নেই টারজানের। বাঁ-হাতখানা আটকে রয়েছে সবুজমণি আগলাবার জন্য। বলা বাহুল্য, ও-মণির যে মন্ত্রশক্তি আছে, এর প্রমাণ পাওয়ার পরে টারজান আর নরখাদকদের গ্রামে ওকে ফেলে আসার কথা ভাবতে পারেনি। ছানছানু সর্দারও মণির সে-গুণের কথা জানে না, সে তা ফেরৎ চাওয়ার দরকার বোঝেনি। দরকার বুঝলেও সে যে চাইবার সাহস পেতো, এমনটাও মনে করার কারণ নেই। সর্দার তখন দানো দেবতাকে যে-কোনো শর্তে গ্রাম থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

চলেছে টারজান। দূরে দূরে শিম্বা শীটারা অল্পস্বল্প হুঙ্কার ছাড়ছে তার গায়ের গন্ধ পেয়ে, কিন্তু এগিয়ে আসার উৎসাহ কেউ পাচ্ছে না। কারণ রাত্রির চরা তাদের উদর পূরণে অক্ষম হয়নি, এখন ভরা পেট নিয়ে শিকারের ঝামেলায় কেউ জড়িয়ে পড়তে চায় না। একপাল হরিণ দৌড়ে চলে গেল, প্রায় টারজানের গা ঘেঁষেই। টারজানেরও উৎসাহ হলো না তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার। কারণ ঐ একই। ঐ সবুজমণি। এটা যতক্ষণ নিরাপদ স্থানে গচ্ছিত রাখতে না পারছে, ততক্ষণ কোনো দৌড়ঝাঁপের ব্যাপারে ভিড়বে না টারজান। কিসে কী হয়, কিছু বলা যায় না। আবার যদি হারিয়ে যায় এই অমূল্য নিধি, সে-আফশোস মরলেও যাবে না অরণ্যপতির। এমরেল্ডার মণি। এমরেল্ডাকে খুঁজে বার করে তার মণি তার হাতে দিয়ে দিতে পারলে সে দায়মুক্ত হতে পারে।

বেলা যখন দুই প্রহর, তখন একটা নিরাপদ স্থান দেখতে পেলো টারজান। নিবিড় বন বটে, কিন্তু তারই মধ্যে খোলা-মেলা আধ একর পরিমাণ একটা সমতল জমি। তার কেন্দ্রস্থলে তিনটি মহাবিটপী রচনা করেছে এক সমবাহু ত্রিভুজ। এক একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হবে দশ-বারো ফুট, ঝরা-পাতায় গোটা ত্রিভুজ-ভূমিটা পুরু করে ঢাকা।

ঐ ত্রিভুজের অন্তর্গত জমিটুকুর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে ঝরা-পাতা সরিয়ে নিজের ছোরা দিয়ে দুই ফুট গভীর একটা গোলাকার গর্ত খুঁড়ে ফেললো টারজান। তারপর পাতায় জড়িয়ে মণিটাকে সেই গর্তে স্থাপন করল। মাটি চাপা দিয়ে, সেই মাটির উপরে আবার চাপা দিল শুকনো ঝরা-পাতা। দূরে দাঁড়িয়ে একবার, নিকটে দাঁড়িয়ে একবার, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল যে নবাগতের চোখে পত্রসজ্জার ভিতরে মানুষের হাতের কাজ ধরা পড়ে কিনা।

নাঃ। টারজান নিশ্চিত হলো যে মানুষ যদি এখানে আসেও, এ-ত্রিভুজের জমিটুকুতে কোনো কৃত্রিমতা তার চোখে কখনো ধরা পড়বে না। এবার টারজান মণি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। সে নিজে না এলে এ-মণির অবস্থান কেউ নির্ণয় করতে পারবে না। এবারে ঝাড়া হাত-পায়ে টারজান বেরুতে পারে এমরেল্ডার খোঁজে।

এমরেল্ডার খোঁজ! এ-যাবৎ খোঁজাখুঁজি চলেছে স্রেফ অনুমানের উপরে নির্ভর করে। এইবার পাওয়া গিয়েছে একটা ক্ষীণ সূত্র। ছানছানু সর্দার বলেছে, আলবুর্জ-রীকিরা সিংহের তাড়া খেয়ে পশ্চিমের অরণ্যে ঢুকে পড়েছিল। আর ঐ পশ্চিম অরণ্যের এক পাহাড়তলিতেই পাওয়া গিয়েছে গলাকাটা সিংহের কঙ্কাল। দুটোয় যদি গিঁট বাঁধা যায়, একটা ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরায় যেন পাওয়া যায় অস্পষ্ট আভাস। গলাকাটা সিংহটা শিকার করেছিল এমরেল্ডা। তাহলে এমনটাও তো ঘটে থাকতে পার যে এমরেল্ডার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আলবুর্জ-রীকির!

আর সেই আলবুর্জ-রীকি, তারা তো পশ্চিম-অরণ্য থেকে নাও বেরিয়ে থাকতে পারে! পশ্চিম-অরণ্যের ভিতরে ভিতরে যদি তারা উত্তরে এগিয়ে থাকে–

কারণ আছে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তরে যাওয়ার। দক্ষিণ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সভ্য, সেখানে সুসংগঠিত সরকার আছে দেশে দেশে, আলবুর্জ-রীকির মতো দুর্বৃত্তেরা এমরেল্ডার মতো একটি গৌরাঙ্গী মহিলাকে নিয়ে সেদিকে যেতে ভয় পাবে। উত্তরে তো অধিকাংশ জনপদই জনবিরল, সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করার কথা বদমাইশ দুটো কি একবারও চিন্তা করেনি?

পথ চলতে চলতে টারজান স্থিরই করেছিল যে প্রথম স্তরের অনুসন্ধান সে উত্তর মুখেই চালাবে। পশ্চিম অরণ্যের ভিতর দিয়ে। এখন সবুজমণি বহনের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়ার পরে সেই সংকল্প অনুযায়ী কাজ করার পক্ষে আর বাধা রইল না কিছু।

কখনো রৌদ্র ঝলমল শূন্য পথ, কখনো স্নিগ্ধ আঁধার বনবীথি অনুসরণ করে দ্রুত পরিক্রমায় ধেয়ে চলেছে টারজান। যদিই এমরেল্ডার সাক্ষাৎ সে মরক্কোর এধারে কোথাও না পায়, আটলাস পর্বত পর্যন্ত গিয়ে তারপর সে ফিরবে, দক্ষিণে উত্তমাশা পর্যন্ত ধাওয়া করবার জন্য। মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, তা সে নিশ্চয়ই করবে ভাগ্যহীনা এমরেল্ডার জন্য। একদিক দিয়ে বালিকাটিকে সে আশ্রিতা বলেই মনে করে। মহৎ চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণই তো আশ্রিতবাৎসল্য!

দুর্বার গতিতে পথ চলেছে টারজান। মাঝে মধ্যে দু'-দণ্ডের বিরতি, একটা হরিণ মেরে খেয়ে নেওয়ার জন্য। তা ছাড়া টারজান থামবে না, যে-কোনো দিক থেকেই বাধা আসুক।

তবু, এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা সত্ত্বেও দুর্বার টারজানকে সেদিন থামতে হলো, দীর্ঘ দু' দুটো দিনেরই জন্য।

ছোট ছোট পাহাড় ঐ-দিকটাতে, সুনিবিড় বাঁশবনে আচ্ছন্ন। তারই ভিতর দিয়ে জন্তু চলাচলের পথ, জায়গায় জায়গায় বেশ প্রশস্ত পথই। তারই একটা দিয়ে চলেছে বনের রাজা, হঠাৎ কানে গেল একটা শব্দ। চিনতে কষ্ট হলো না, আশৈশব হাতির গলার নানাবিধ আওয়াজ শুনে শুনে প্রত্যেকটার বৈশিষ্ট্য আর আবেদন বুঝতে শিখেছে টারজান।

এ-ডাক কোনো বিপন্ন হাতির। তার ডাক দুর্বল, যেন জন্তুটা অনেকদিন ধরে অনাহারে রয়েছে। হাতিরা টারজানের চিরদিনের বন্ধু, সে ওদের আদুরে নাম রেখেছে ট্যাণ্টর। শৈশবে ট্যাণ্টরেরা ধাই-মা কালা-বানরীর কোল থেকে টারজানকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে যেতো, পিঠে বসিয়ে বনে বনে ঘুরপাক খাওয়াবার জন্য। সেদিনকার বন্ধুত্ব আজ প্রৌঢ় বয়সেও ভোলেনি টারজান, যে-কোনো হাতির জন্য সে যে-কোনো কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত।

যে-পথে যাওয়ার কথা তার, আর হলো না সে-পথে যাওয়া। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে দিয়ে সে চললো, হাতির বৃংহণের দিকে কান রেখে। চললো হাওয়ার অনুকূলে। এটা একটা অসুবিধা। হাতির নিকটে যদি অন্য কোনো জীব থাকে, তার গন্ধ এখন কোনোমতেই পাবে না ও। অথচ সেটা দূর থেকে যদি পাওয়া যায়, অজানা বিপদের মোকাবিলায় কত-না সুবিধা হতে পারে তা থেকে!

নাঃ, কোনো গন্ধই পাওয়া যায় না। হাতিটা অবশ্যই আছে, কারণ এখনও তার আর্তকণ্ঠের চীৎকার মাঝে মাঝেই শুনতে পাচ্ছে টারজান। সে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল।

এইবার শোনা যাচ্ছে দ্বিতীয় একটা চীৎকার! ড্যাঙ্গো! হায়না! ডাকলে মানুষের হাসির মতো খলখল শব্দ হয়। অতি নোংরা, অতি ভীতু জানোয়ার। জ্যান্ত জন্তুর সামনে যেতে সাহস পায় না। মুমূর্ষুর আশেপাশে ওৎ পেতে থাকে শকুনের মতো, তার মৃত্যুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করে।

ড্যাঙ্গোর উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়, হাতিটা প্রায় মৃত্যুমুখে উপনীত হয়েছে। হলো কী ওর? ব্যাকুল হয়ে উঠল টারজানের অন্তর। কবে সেই সুদূর শৈশবে একটা হাতি-বন্ধুকে সে ট্যাণ্টর বলে ডেকেছিল। তার শুঁড়ের কুণ্ডলিতে বসে আরামে দোল খেতে খেতে আধো-আধো ভালোবাসার বুলি শুনিয়েছিল তাকে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যে-কোনো হাতিই তার কাছে ট্যাণ্টর, যে-কোনো ট্যাণ্টরই তার বন্ধু।

বন্ধুকে বিপন্ন বলে জেনেছে যখন, টারজান কি তার সাহায্যে না গিয়ে পারে? তাতে যদি এমরেলডার ব্যাপারটা অবহেলিতই হয় একটু কী আর করা যাবে?

আর বেশি দূরে নয় বিপন্ন বন্ধু। টারজান অতিমাত্র সতর্ক হয়ে উঠেছে। কোথায় কোন্ শিকারী ফাঁদ পেতে রেখেছে, ঠিক কী তার? জীবনটা যদি বাঁচাতে হয় এই জঙ্গল-মহলে, সতর্ক থাকতে হবে আমরণ।

এইবার সে এসে পড়েছে। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে নজর চালিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে বিপন্ন একটা মহাকায় প্রাণীকে। গভীর এক ডোবার কাঁধায় দুই দুটো হায়না। ডোবা এতই গভীর যে তার ভিতরে যে-ট্যাণ্টর বন্দী হয়ে আছে, তার পিঠখানাও টারজানের চোখে পড়ছে না।

ট্যাণ্টরের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, তা জানে ঐ যুগল ড্যাঙ্গো, তারা ক্রমাগত ঘুরছে ডোবার চারিধারে আর খ্যাক-খ্যাক করছে ফাঁদে-বন্দী জীবটাকে লক্ষ্য করে। সে চ্যাঁচানির অর্থ—"তুই মরতে এত দেরি করছিস কেন হতভাগা হাতি? আমাদের যে খিদে পেয়েছে!"

উপর আকাশে অমনি চক্কোর দিচ্ছে শকুন-বৃদ্ধ স্কা। তারও ঐ রকমই ভাবখানা—"চটপট মর বাপু, আমরা খিদেয় মরে যাচ্ছি।" বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে টারজান এগিয়ে গেল। ফাঁদ পাতার আগে খানিকটা জায়গায় জঙ্গল সাফ করতে হয়েছিল শিকারীদের। সেই পরিষ্কার স্থানটুকুতে দাঁড়িয়ে ডোবার ভিতরে নজর দিল টারজান। আর অমনি হায়না দুটো খ্যাক খ্যাক শুরু করল আবার। এবার আর হাতিকে লক্ষ্য করে নয়, টারজানকে লক্ষ্য করে। টারজান অবশ্য তাদের দিকে ফিরেও চাইল না। আর তা চাইল না বলেই ড্যাঙ্গোরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। তবু কি তাদের গলাবাজি কমে? খ্যাক খ্যাক তারা করেই যাচ্ছে পূর্ণোদ্যমে। তবে ওদের নিয়ে টারজান মাথা ঘামাচ্ছে না। সে জানে যে মানুষকে আক্রমণ করতে কখনো সাহস পায় না হায়নারা, যদি অবশ্য সে-মানুষটা রুগ্ন মুমূর্ষু না হয়।

টারজান ডোবার দিকে এগুচ্ছে। ডোবার ভিতর থেকে দুর্বল কণ্ঠে তাকে হুঁশিয়ার করে দিল ট্যাণ্টর। সে-হুঁশিয়ারির অর্থ—"সাবধান! সাবধান! আমি অসাবধানে ফাঁদে পড়ে গিয়েছি, তুমিও যেও না যেন।"

হাতিটার গায়ের চামড়া ঢিলে থলথল করছে। অর্থাৎ ও খেতে পায়নি অনেকদিন। টারজান ভাবছে, অনেকদিন অনাহারে আছে জন্তুটা, অর্থাৎ ও গর্তে পড়েছিল অনেকদিন আগে, তারপর থেকে শিকারীরা আর তদারক করতে আসেনি যে এদিককার ফাঁদটাতে জন্তুজানোয়ার কিছু পড়ল কিনা।

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

কপিলের কৃতিত্ব এবং সেজদাদু

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিল্টু-মন্টুদের সেজদাদু এখন খুব খুশি। ক্রিকেটের কথা উঠলেই নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু কেউ যদি ভুল করেও ফুটবলের কথা তোলেন তাহ'লে তিনি রেগে আগুন। বিল্টু-মন্টুরা তাই সব সময় ছোটদাদুর কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে। ফুটবলের কথা কাউকে বলতেই দেয় না। নেহরু ফুটবলের কথাও না। কলকাতায় জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে সে বিষয়েও ওরা চুপচাপ। আসলে সেজদাদুকে খোশ মেজাজে রাখতে পারলে বিল্টু-মন্টুদেরই লাভ। দিব্যি বাড়ির সামনে গলিতে ওদের টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়। ক্রিকেট খেলতে দেখলে সেজদাদু কিচ্ছু বলেন না। বলেন, হ্যাঁ, যে দেশে সুনীল গাভাসকার, কপিলদেবের মতো খেলোয়াড় আছে সে দেশের ছেলে মেয়েদের তো ক্রিকেট খেলাই উচিত।

কটকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে কপিলদেব যেদিন তিনশ উইকেট পেলেন সেদিন সেজদাদু আনন্দের চোটে সকলকে সন্দেশ খাইয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দর বাড়ির কাছে সিমলা স্ট্রিটে গিয়ে দারুণ সন্দেশ এনেছিলেন বিল্টু-মন্টুর বাবা। সবাই যখন মজা করে সন্দেশ খাচ্ছেন তখন সেজদাদু বললেন, বল দেখি টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম তিনশ উইকেট কে পেয়েছিলেন?

সেজদাদুর কাছে এত বড় করে কিছু বলা যাবে না। বললেই রেগে যাবেন। স্কুলের মতো হাত তুললো বিল্টু-মন্টু। ওদের দিদিও হাত তুলেছিলেন। সেজদাদু কিন্তু বিল্টুকেই জিজ্ঞেস করলেন।

বিল্টু বললো, ইংলন্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম তিনশ উইকেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

উত্তর শুনে মাথা নাড়লেন সেজদাদু। ঠিক ঠিক। সেদিন ছিলো ১৯৬৪ সালের ১৫ আগস্ট। হ্যাঁ আমাদের স্বাধীনতা দিবসের দিন। সেদিন ছিল ইংলন্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিন। অস্ট্রেলিয়ার তখন আট উইকেটে ১৭৪। ব্যাট করছেন নিল হক। বল ফ্রেডি ট্রুম্যানের হাতে। আর একটি উইকেট পেলেই ট্রুম্যান টেস্ট ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। প্রথম বোলার হিসেবে পাবেন তিনশ উইকেট। ওভালের দর্শকরা উত্তেজনায় টানটান। তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন সেই মুহূর্তটির জন্যে। ট্রুম্যান ছুটে এসে বল করলেন। দুর্দান্ত আউট সুইংগার। বল হকের ব্যাট ছুটে সোজা গিয়ে জমা পড়লো স্লিপে কলিন কাউড্রের হাতে। হক আউট। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে তিনশ উইকেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করলেন ট্রুম্যান। এর এক বছর পরে ১৯৬৫ সালে লর্ডসে

কপিলদেব

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলে ট্রুম্যান যখন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন তখন তাঁর সংগ্রহ ৩০৭টি উইকেট। ট্রুম্যান মোট ৬৭টি টেস্ট খেলেছেন।

এর ঠিক দশ বছর পরে ১৯৭৫ সালের ১২ ডিসেম্বর পার্থের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার গ্যারি গিলমোরকে আউট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ল্যান্স গিবস টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে তিনশ উইকেটের গন্ডি ডিঙোলেন। এর ঠিক দেড় মাস পরে মেলবোর্নে শেষ টেস্ট খেলতে নামলেন গিবস। এবং ইয়ান রেডপাথকে আউট করে টেস্ট ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশি উইকেট দখলের নতুন নজির গড়লেন। গিবসের তখন ৪১ বছর বয়েস। এবং ৭৯টি টেস্ট খেলে তিনি পেলেন ৩০৯টি উইকেট।

সেজদাদু একটা জলভরা সন্দেশ তুলে নিতে নিতে বললেন, এরপর কিন্তু সাত বছরও কাটলো না গিবসের রেকর্ড ভেঙে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি। ১৯৮১ সালের ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের ওয়াসিম রাজাকে আউট করে লিলি তিনশ উইকেট দখল করেন। কিন্তু কেরি প্যাকারের দলে চলে যাবার জন্যে গিবসের নজির ডিঙোতে লিলির কিছু দেরি হয়ে যায়। তবে টেস্ট ক্রিকেটে সব থেকে বেশি উইকেট দখলের (৩৬৬টি) রেকর্ড তাঁরই ছিল। সে রেকর্ড এতোদিনে ভেঙে দিয়েছেন ইংলন্ডের অলরাউন্ডার ইয়ান বথাম।

তবে বথামের ঠিক এক বছর আগেই টেস্ট ক্রিকেটে তিনশ উইকেট দখল করেছিলেন ইংলন্ডের আর এক ফাস্ট বোলার

বেংসরকারকে নিয়ে সমর্থকদের উল্লাস।

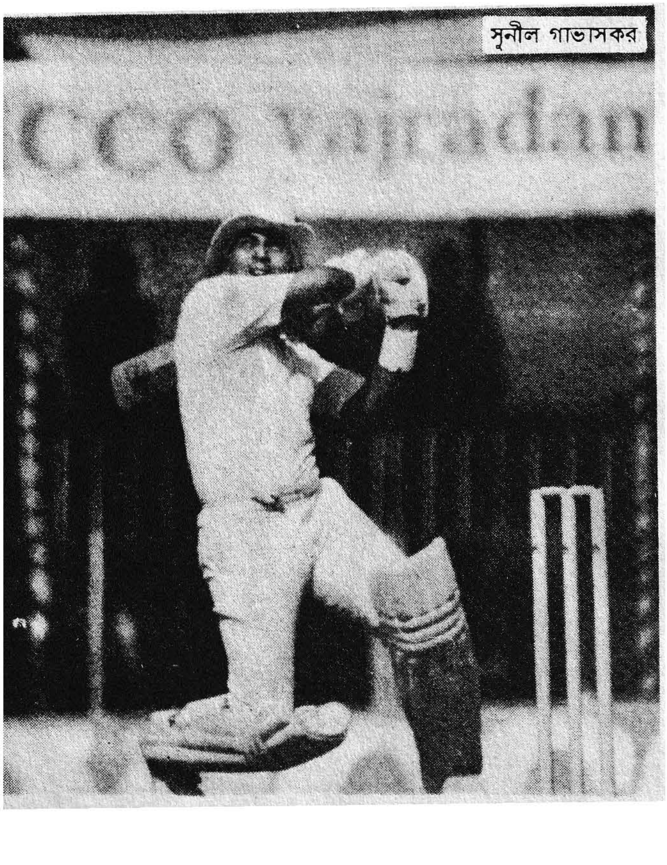

বব উইলিস। ৯০টি টেস্টে ৩২৫টি উইকেট দখল করে উইলিস টেস্ট ক্রিকেটের আসর থেকে সরে যান। অস্ট্রেলিয়ার কিম হিউজকে আউট করে উইলিস তিনশ উইকেট পেয়েছিলেন।

১৯৮৪ সালের ৯ আগস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটরক্ষক জেফ দুঁজোকে আউট করে বথাম টেস্ট ক্রিকেটে তিনশ উইকেট দখল করেন বিশ্বের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে। সেদিন দুঁজোর ক্যাচটি লুফেছিলেন ক্রিস ট্যাভারে। তবে প্রথম অলরাউন্ডার হিসেবে বথাম ঐ কৃতিত্ব অর্জন করেন। শুধু তাই নয় টেস্ট ক্রিকেটে তিন হাজার রান আর তিনশ উইকেট দখলের প্রথম নজির গড়েন তিনি ৮৯টি টেস্টে ৩৬৭টি উইকেট পেয়ে। ৭২তম টেস্টে বথাম টেস্টে ক্রিকেটে তিনশ উইকেট পান। তিন হাজার রান অবশ্য আগেই করে ফেলেছিলেন।

টেস্ট ক্রিকেটে খুব তাড়াতাড়ি তিনশ উইকেট দখল করেছেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার রিচার্ড হ্যাডলি। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়েলিংটন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বর্ডারকে আউট করে হ্যাডলি টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট পান। সেটি ছিল হ্যাডলির ৬১তম টেস্ট। এখন পর্যন্ত ৬৬টি

ডাকব্যাক – ডানপিটেদের স্কুলব্যাগ

স্কুলের বাচ্চাদের কাছে
কিছুই যেন টেকে না ! আর
সেইজন্যইতো তাদের চাই
ডাকব্যাক স্কুল ব্যাগ । যত
ডানপিটেই হোক না কেন, এই
ব্যাগের মজবুত গড়ন আর
ভেতরের শক্ত লাইনিং সহজে
ছিঁড়বে না । শুধু তাই নয়, এই
ব্যাগ ওয়াটার প্রুফ কাপড়েও
পাওয়া যায় ।
চাই ডাকব্যাক স্কুলব্যাগ
কারণ অন্য ব্যাগের থেকে
আরো অনেক বেশি টেকে ।

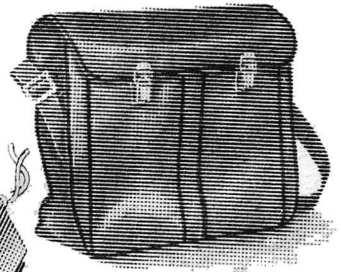

Duckback Makes Life Easier

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেড
২৩০এ, এ. জে. সি বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২০

Mileage BW 2/87

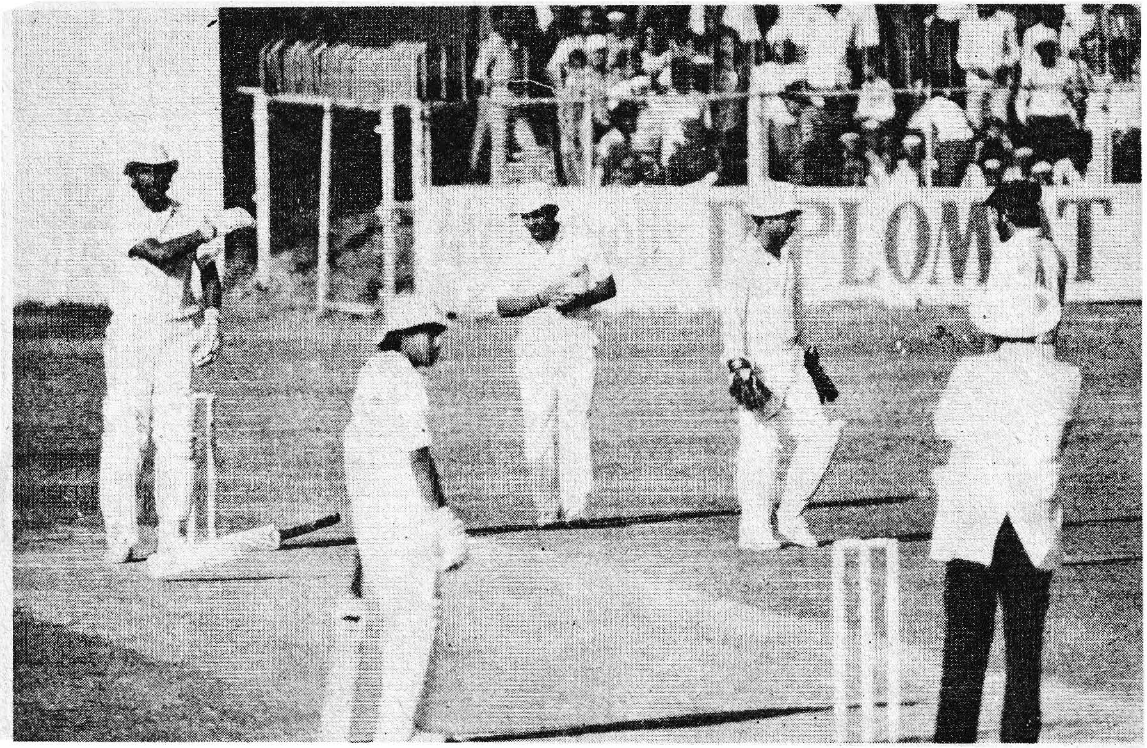

নাগপুর টেস্টে আউট হবার পর ব্যাট ফেলে দিচ্ছেন রবি রত্নায়েক।

টেস্টে খেলে হ্যাডলি দখল করেছেন ৩৩৪টি উইকেট।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কটকের তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক কপিলদেব তিনশ উইকেট দখল করেছেন। তিন হাজার রান কপিল আগেই করেছিলেন। ইয়ান বথামের পর বিশ্বের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কপিল অর্জন করে ঐ কৃতিত্ব। কপিল ২৮ বছর বয়সে তিনশ উইকেট আর তিন হাজার রান পেলেন। বথাম পেয়েছিলেন ২৯ বছরে। কপিল টেস্ট খেলতে নামার এক বছর ও ১০৫ দিনের মাথায় ১০০ উইকেট পেয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শত উইকেট দখলের এটি বিশ্বরেকর্ড। ১৯৮৩ সালে পোর্ট অফ স্পেনে 50তম টেস্টে কপিল ২০০ উইকেট পান। কিন্তু পরবর্তী একশ উইকেট পাবার জন্যে কপিলকে ৩৩টি টেস্ট অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

একটানা কথা বলে সেজদাদু চুপ করলেন। বিল্টু-মন্টু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো। এতো সব রেকর্ড কি করে সেজদাদুর মনে আছে? ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে সেজদাদু একটা কাগজ দেখালেন। তাতে সব লিখে রেখেছেন তিনি। তাই বলতে অসুবিধে হয়নি।

অলউইস আউট হতেই ভারত জিতে গেল। আনন্দে উদ্বেল বোলার মনিন্দর সিং এবং শ্রীকান্ত, কিরণ মোরে, সুনীল গাভাসকর ও অরুণলাল।

নিচে টেস্ট ক্রিকেটে তিনশ উইকেট ক্লাবের সদস্যদের বোলিংয়ের হিসেবে দেওয়া হলো–

	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বথাম	৮৮	১৯,৮৩৮	৬৯৯	৯৮২৮	৩৬৫	২৬,৯২
লিলি	৭০	১৮,৪৬৭	৬৫১	৮৪৯৩	৩৫৫	২৩,৯২
হ্যাডলি	৬৬	১৭,১৮৫	৬২২	৭৫১৯	৩৩৪	২২,৫১
উইলিস্	৯০	১৭,৩৫৭	৫৪৪	৮১৯০	৩২৫	২৫,২০
গিবস	৭৯	২৭,১১৫	১৩১৩	৮৯৮৯	৩০৯	২৯,০৯
ট্রুম্যান	৬৭	১৫,১৭৮	৫২২	৬৬২৫	৩০৭	২১,৫৭
কপিল	৮৩	১৭,৫৯৪	৬১০	৮৭১৫	৩০০	২৯,০৫

(ভারত-শ্রীলঙ্কার তৃতীয় টেস্ট এবং ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট পর্যন্ত।)

মনিন্দর সিং ও রবি শাস্ত্রী।

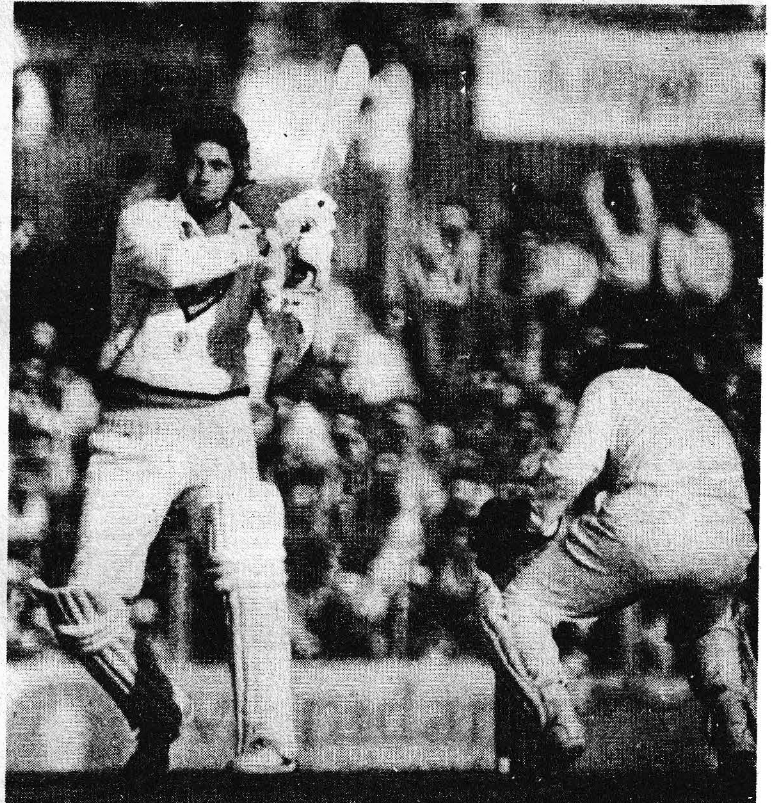

ঘুরিয়ে মারছেন মহিন্দর অমরনাথ

এই সংখ্যার সব ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

জাতীয় ভারোত্তোলনে বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন

সম্প্রতি এর্নাকুলামে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম জাতীয় ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জিতেছে ৮টি সোনা, ৩টি রুপো এবং ৪টি ব্রোঞ্জ। তাঁরা সাতটি জাতীয় রেকর্ডও করেছেন। সেরা ফল দেখিয়েছেন ছায়া আদক, সান্ত্বনা গাঙ্গুলি ও জ্যোৎস্না দত্ত। পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার স্থান হয়েছে চতুর্থ। চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস। আন্তঃ-রাজ্য প্রতিযোগিতায় বাংলার পুরুষরা রানার্স হয়েছে। গত ১২ বছরে বাংলা কোনো ট্রফি পায়নি। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিলনাড়ু।

প্রশ্ন

(১) ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার রেজাল্ট কি? কোন দলের কে কে গোল দিয়েছিলেন?
(২) সেবারের তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ের ফলাফল কি?
(৩) টেস্ট ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশি হাফ সেঞ্চুরি করার রেকর্ড কার?
(৪) ফুটবল জগতে কাইজার ও চাইনিজ ওয়াল বলে কাকে কাকে অভিহিত করা হয়?
(৫) এশিয়া ক্রীড়ায় ভারত ফুটবলের স্বর্ণপদক পেয়েছে ক'বার? কে কে অধিনায়ক ছিলেন?
(৬) মোহনবাগানের কোন প্রাক্তন খেলোয়াড়ের গলায় দুলেছে ওলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক?
(৭) মারাদোনাকে প্রতারক বলেছিলেন কেন পেলে?
(৮) শ্রীলঙ্কা-ভারতের টেস্ট লড়াইয়ের ম্যান অফ দ্য সিরিজ কে হয়েছিলেন?
(৯) পরবর্তী এশিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কোথায় হবে?
(১০) বাঙালীদের মধ্যে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলেন কে?
(১১) কোনো বাঙালী খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের নেতৃত্ব করেছেন কি?
(১২) ইডেনে প্রথম টেস্ট খেলা হয় কোন সালে? কার বিরুদ্ধে?
(১৩) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতের প্রথম অধিনায়ক কে ছিলেন?

স্পোর্টস কুইজ

উত্তর

(১) আর্জেনটিনা (৩) : হল্যান্ড (১)
(কেমপেস ও বারতোনি) (নানিংগা)
(২) ব্রাজিল (২) : ইতালি(১)
(৩) ভারতের সুনীল গাভাসকার ও ইংলন্ডের জিওফ বয়কটের যুগ্মভাবে। (শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলা পর্যন্ত)
(৪) কাইজার–জার্মানির প্রাক্তন অধিনায়ক ফ্রাংক বেকেনবাউয়ার। চাইনিজ ওয়াল–ভারতের গোষ্ঠ পাল।
(৫) দুবার–শৈলেন মান্না ও চুনী গোস্বামী।
(৬) গুরবক্স সিংয়ের।
(৭) বিশ্ব কাপে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে মারাদোনা হাত দিয়ে গোল করেছিলেন বলে।
(৮) দিলীপ বেংসরকার।
(৯) চীনের রাজধানী পিকিংয়ে।
(১০) পি সেন।
(১১) হ্যাঁ করেছেন। পংকজ রায়-একটি টেস্ট–ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে।
(১২) ১৯৩৪ সালে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে।
(১৩) লালা অমরনাথ।

কপিলের কৃতিত্ব

টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট দখল করে কপিলদেব এক অনন্য নজির গড়েছেন। প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে তিনি এই গৌরব লাভ করলেন। আর বিশ্বের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট আর তিন হাজার রান করেছেন। নিচে কপিলদেব কোন দেশের বিরুদ্ধে ক'টি উইকেট পেয়েছেন তার হিসেব দেওয়া হলো–

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে–
৭৬টি উইকেট ২১৭৪ রানে। ২০টি টেস্টে। উইকেট প্রতি গড় রান ২৬.৬০। সেরা বোলিং ৮৫ রানে ৮টি উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে–
৬৩টি উইকেট ১৫২২ রানের বিনিময়ে। ১৭টি টেস্টে। গড় ২৪.১৫। সেরা বোলিং ৮৩ রানে ৯টি।

ইংলন্ডের বিরুদ্ধে–
৭১টি উইকেট ২৫৯৬ রানে। ২১টি টেস্টে। গড় ৩৬.৫৭। সেরা বোলিং ৮১ রানে ৬টি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে–
৫৪টি উইকেট ১৩৫৭ রানের বিনিময়ে। ১৫টি টেস্টে। উইকেট প্রতি গড় রান ২৫.১২। সেরা বোলিং ১০৬ রানে ৮টি উইকেট।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে–
৮টি উইকেট ২৫৫ রানে। ৩টি টেস্টে। উইকেট প্রতি গড় ৩১.৮৭। সেরা বোলিং ৩৪ রানে ৪টি উইকেট।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে–
২৮টি উইকেট ৮১১ রানে। ৭টি টেস্টে। উইকেট প্রতি গড় রান ২৮.৯৬। সেরা বোলিং ১১০ রানে ৫টি উইকেট।

(কপিল ৭ বার এক ইনিংসে ৫টি বা তার বেশি উইকেট পেয়েছেন। একবার একটি ম্যাচে ১০টি উইকেট দখল করেছেন।)

অরুণলাল

ক্রিকেটের লর্ড কলাইভ

কুড়ি

ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাবার জেতার পর লয়েড তাঁর দল নিয়ে এলেন এই ভারতে। এই ভারতের মাটিতেই জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন এখানেই! এবার সেই ভারতে খেলতে এলেন অধিনায়ক হিসেবে। ভারতের পর দল নিয়ে তিনি যাবেন পাকিস্তানে। লম্বা সফর। তার জন্যে লয়েডও তাঁর দলবল নিয়ে তৈরি।

ওদিকে ভারতীয় ক্রিকেটে তখন টালমাটাল অবস্থা। পাতৌদির বদলে দলনেতার পদ পেয়ে অজিত ওয়াদেকার ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাবার জিতে ভারতীয় ক্রিকেটের নব জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াদেকারের স্বর্ণযুগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইংলন্ডে গিয়ে সব কটি টেস্টে বিশ্রীভাবে হেরে তিনি হারিয়ে এলেন মান, সম্মান এবং ইজ্জতও। শুধু নেতৃত্ব পদ থেকেই নয়, খেলাও অকালে ছেড়ে দিলেন ওয়াদেকার। অথচ ওয়াদেকার তখন পুরো ফর্মে ছিলেন। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ভারতীয় ক্রিকেটের লাকি ক্যাপ্টেন অজিত ওয়াদেকার সরে গেলেন খেলার মাঠ থেকে।

কিন্তু কার ওপর দেওয়া হবে ভারতীয় দলের ভার। ক্লাইভ লয়েড তাঁর শক্তিশালী ক্যারিবিয়ান দল নিয়ে আসছেন। ব্যাটিং, বোলিংয়ে দারুণ সে দলের খেলোয়াড়রা। তাঁদের সঙ্গে সমানে সমানে তাল দেবার মতো যোগ্য অধিনায়ক ভারতে আর কই! কার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে ভারতীয় দলের দায়িত্ব!

সেই মুহূর্তে মনসুর আলি খান পাতৌদি ছাড়া আর কাউকেই যোগ্য বলে মনে হলো না। অথচ বিনা কারণে পাতৌদিকে নেতৃত্ব থেকে আচমকাই সরিয়ে দিয়ে অজিত ওয়াদেকারকে করা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। নির্বাচক মন্ডলীর সভাপতি বিজয় মার্চেন্টের ক্যাস্টিং ভোটেই ওয়াদেকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর কাউকে না পেয়ে আবার সেই পাতৌদির কাঁধেই চাপিয়ে দেওয়া হলো ভারতীয় ক্রিকেটের ভার।

কিন্তু প্রথম দুটি টেস্টে ভারত দাঁড়াতেই পারলো না। হেরে গেলো বিশ্রীভাবে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র যে পাতৌদি নন তার প্রমাণ পাওয়া গেলো কলকাতার তৃতীয় টেস্টে। প্রথম দুটি টেস্টে পরাজয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পাতৌদির নেতৃত্বে ভারতীয় খেলোয়াড়রা রুখে দাঁড়ালেন। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন লেগ স্পিনার ভগবৎ চন্দ্রশেখর। শেষ দিন সকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন ব্যাট করতে নামলো তখন আশা-নিরাশার দোলায় দুলছেন ইডেনের এক লক্ষ দর্শক। দলনেতা পাতৌদি বল তুলে দিলেন চন্দ্রর হাতে। গোড়ার দিকে। ঠিক মতো লেংথে পড়ছিলো না চন্দ্রশেখরের বলগুলো। দিব্যি রান উঠছিলো। তখন মাঠ জুড়ে চিৎকার। বোলার বদল করার আবেদন। কিন্তু লক্ষ লোকের আবেদনও কানে তুললেন না

পাতৌদি। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। টানা বল করিয়ে চললেন চন্দ্রশেখরকে দিয়ে। পুরস্কারও মিললো হাতে হাতে। দেখতে দেখতে ভয়ংকর হয়ে উঠলেন চন্দ্রশেখর। তাঁর স্পিনের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানরা। আউট হতে লাগলেন একে একে। ২২৪ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। বাঙ্গালোর ও দিল্লির প্রথম দুটি টেস্টে হারের পর কলকাতায় ভারত জিতলো ৮৫ রানে। সেই খেলায় ভারত করেছিলো ২৩৩ আর ৩১৬ রান। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪০ ও ২২৪ রান।

এই জয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়িয়ে দিলো অনেকখানি। মাদ্রাজ টেস্টে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফলাফল সমান সমান করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই মাঠে নামলেন। হলোও তাই। দুর্দান্ত খেললেন বিশ্বনাথ। দারুণ বল করলেন চন্দ্রশেখর। সেই টেস্টে ভারত কিন্তু খুব বেশি রান করতে পারেনি। করেছিলো ১৯০ আর ২৫৬। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২ ও ১৫৪। মাদ্রাজে ভারত জিতলো ১০০ রানে। কলকাতা আর মাদ্রাজ টেস্টে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ করেছিলেন ৫২ ও ১৩৯ এবং ৯৭ ও ৪৬ রান। আর ভারতকে জয় এনে দিতে নিপুণ হাতে বল করেছিলেন বেদী, প্রসন্ন আর চন্দ্রশেখর।

ফলাফল সমান সমান। এবার বোম্বাইয়ের শেষ টেস্ট। যে জিতবে সেই পাবে রাবার। খেলা হবে নতুন ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে। নতুন পিচ নিয়ে দুদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সন্দেহ টসে যে দল জিতবে জয়লক্ষ্মী যে তাদের দিকেই খানিকটা ঢলে পড়বে সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই ছিলো না।

পাতৌদি পারলেন না। টসে জিতলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লয়েড টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এনে দিলেন বাড়তি সুবিধে। খেলা আরম্ভ হতেই বোঝা গেলো উইকেট রানে ভরা। তার সুযোগ পুরোপুরি নিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা। প্রথম দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুলে নিলো ৩০৯ রান। মাত্র তিনটি উইকেটের বিনিময়ে। দলনেতা লয়েড ৫০ রান অপরাজিত রইলেন। দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই লয়েড ঝড়ের গতিতে রান তুলতে লাগলেন। দেখতে দেখতে হয়ে গেলো তাঁর সেঞ্চুরি। কিন্তু ব্যাট হাতে নিয়ে ছুটে চললেন লয়েড। ১৫০ রান। তারপর একসময় ডবল সেঞ্চুরিও হয়ে গেলো তাঁর। আর তারপরই ঘটলো ঘটনাটা। লয়েড ডবল সেঞ্চুরি করতেই পনেরো ষোল বছরের একটি ছেলে বেড়া টপকে ঢুকে পড়লো মাঠে। ছুটে গিয়ে লয়েডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ফিরে গেলো। ব্যাপারটা ওখানেই মিটে যেতো। কিন্তু তা হলো না পুলিশের জন্যে। পুলিশ ছেলেটিকে ধরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে নির্মমভাবে পেটাতে শুরু করলো। রাগে ফুঁসে উঠলো দর্শকরা। শুরু হয়ে গেলো দর্শকদের সঙ্গে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ। ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম তখন রণক্ষেত্র। খেলোয়াড়রা ছুটে গিয়ে প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নিলেন। মিছিমিছি ঘন্টা দেড়েক সময় নষ্ট হলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ উইকেটে ৬০৪ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিল। ভারতও পাল্টা জবাব দিয়েছিলো। গাভাসকার আর বিশ্বনাথ দারুণ ব্যাট করে ভারতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের মিডিয়াম পেস বোলার ভ্যানবার্ণ হোল্ডার সব কিছু বদলে দিলেন। যে খেলায় মীমাংসার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না হোল্ডারই সেই খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জিতিয়ে দিলেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে দু'জন ব্যাটসম্যানকে তিনি আউট করে দিয়েছিলেন। সেই খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ করেছিলো ৬ উইকেটে ৬০৪ ও ৩ উইকেটে ২০৫ রান। ভারত ৪০৬ ও ২০২ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতলো ২০১ রানে।

ভারতের বিরুদ্ধে ৩–২ টেস্টে জিতে রাবার পকেটে পুরে ক্লাইভ লয়েড তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানে খেলতে গেলেন।

[চলবে]

বেরুল
অনিল ভৌমিকের
রূপোর নদী-র আগের চারটি
ফ্রান্সিস-পর্ব একত্রে
ফ্রান্সিস সমগ্র ২৫্
রূপোর নদী
সোনার ঘন্টা ১০্
মুক্তোর সমুদ্র ১০্
হীরের পাহাড় ৮্
তুষারে গুপ্তধন ১০্
চারটি আলাদাও পাওয়া যাচ্ছে।
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
দীঘা সৈকতে আতঙ্ক ১০্
পান্ডব গোয়েন্দার পর
কাকাহিগড় অভিযান ১০্
বিমল মিত্র
কিশোর অমনিবাস ১৫্
টক-ঝাল-মিষ্টি ১৪্ লাল-নীল-হলদে ১৪্
বুদ্ধদেব গুহ'র
জেঠুমণি অ্যান্ড কোম্পানি ১০্ ল্যাংড়া পাহান্ ১০্
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রত্নগুহার গুপ্তধন ১০্
ইন্দ্রজালের মায়া ১০্ পদচিহ্নের উপাখ্যান ১০্
রবিদাস সাহারায়ের ভাইবোন ৮্ পান্না হীরে চুনী ১৮্
শেখর বসু-র ভূতেরা চাউমিন ভালবাসে ৮্
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির * সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট * কলি

তোমাদের ? জিজ্ঞাসা

মনোজ বিশ্বাস (রজামাডোবা, ভাগা, ধানবাদ)

উত্তর: শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এখন চলছে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা। তাই আর খেলার তারিখগুলো দিলাম না।

বিতান চ্যাটার্জি (শরৎ বসু রোড, কলকাতা–২৬)

উত্তর: তোমার চিঠি পাবার পর আমরা মোহনবাগানের ক্রিকেট ও হকি অধিনায়কদের নাম চেয়ে পাঠিয়েছি। ওঁরা পাঠালেই তোমায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

শাশ্বতী মুখার্জি (শ্রীরামপুর)

উত্তর: তোমার গড়া দল দুটি ছেপে দেওয়া হলো। এই দুই দলের মধ্যে খেলা হলে কারা জিততে পারে–তোমরাই ঠিক করো না!

প্রথম দল: গাভাসকার, কপিলদেব, ভিভ রিচার্ডস, রবি শাস্ত্রী, ডেভিড গাওয়ার, জোয়েল গারনার, এলান বর্ডার, ল্যারি গোমস, রিচার্ডসন, ইমরাণ খান ও আজাহারউদ্দিন। দ্বাদশ ব্যক্তি–ম্যাকডরমট।

দুনম্বর দল: ইয়ান বথাম, জাবেদ মিয়াদাদ, রজার হারপার, প্যাটারসন, সৈয়দ কিরমানি, মার্টিন ক্রো, রিচার্ড হ্যাডলি, ম্যালকম মার্শাল, শ্রীকান্ত, হোল্ডিং ও মাইক গ্যাটিং। দ্বাদশ ব্যক্তি–রমন লাম্বা।

প্রদীপ চক্রবর্তী (ডিগবয়, আসাম)

প্রশ্ন: টেস্ট খেলায় ভারত সব শেষে কোন দেশের বিরুদ্ধে জিতেছে?

উত্তর: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৯৮৬-৮৭ মরশুমে ২–০ টেস্টে।

অরুণ ও গৌতমকুমার মাল (বদিবগ, গড়বেতা, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন: ভারত কোন সালে কোন দেশের বিরুদ্ধে কোথায় প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলো? কে অধিনায়ক ছিলেন এবং সেই খেলার ফলাফল কি হয়েছিলো?

উত্তর: ভারত প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলো ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালে লর্ডস মাঠে। সি কে নাইডু ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। সেই খেলায় ইংলন্ড জিতেছিলো।

আমি রেকর্ড গড়ার জন্যে খেলি না। আমি দেশকে সব জয় এনে দেবার চেষ্টাই করি।

কপিলদেব

(কটকে তিনশ উইকেট দখলের পর).

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল–বিস্ময়। অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম। আর ভাবছিলাম আমাদের এই পোড়া দেশ থেকেও একজন তিনশ উইকেট পেল (সঙ্গে তিন হাজারের বেশি রান)। যে দেশের জমি চিরকাল পেস বোলারদের বধ্যভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অভিনন্দন কপিল! আমরা সহযোদ্ধারাও আজ তোমার সাফল্যে গর্বিত, রোমাঞ্চিত গোটা দেশই। ইয়ান বথাম, ডেনিস লিলি, রিচার্ড হ্যাডলি, বব উইলিস, ল্যান্স গিবস আর ফ্রেডি ট্রুম্যানের পর সপ্তম নামটাই আমাদেরই একজনের, এটা ভাবলেই গর্ব হচ্ছে।

সুনীল গাভাসকার

(কপিলের তিনশ উইকেটের বিষয় লিখতে গিয়ে)

উক্তি

ভগবানের হাত দিয়ে নয়, বিশ্ব কাপে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটা আমি হাত দিয়েই করেছিলাম।....আমি পেশাদার খেলোয়াড়। রেফারি গোল দিলে আমি কেন আপত্তি করবো?

দিয়েগো মারাদোনা

(লন্ডনের এক দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে)

আমার গায়ের রং যদি কালো না হয়ে সাদা হতো তাহলে কি সমারসেটের কর্তা আমার সঙ্গে ঐরকম ব্যবহার করার সাহস পেতেন?

ভিভিয়ান রিচার্ডস

(সামারসেট থেকে ছাঁটাই হয়ে যাবার পর)

ভিভ মস্ত বড় খেলোয়াড়। আমার ভীষণ বন্ধুও। ওর সঙ্গে সমারসেট যে ব্যবহার করল তারপর আমার আর ঐ কাউন্টি দলে খেলা উচিত নয়। খেলবোও না।

ইয়ান বথাম

(সমারসেট কাউন্টি দল থেকে ভিভ রিচার্ডস ছাঁটাই হয়ে যাবার পর)

পড়ার সঙ্গে খেলা
আদি মহাকালী পাঠশালা

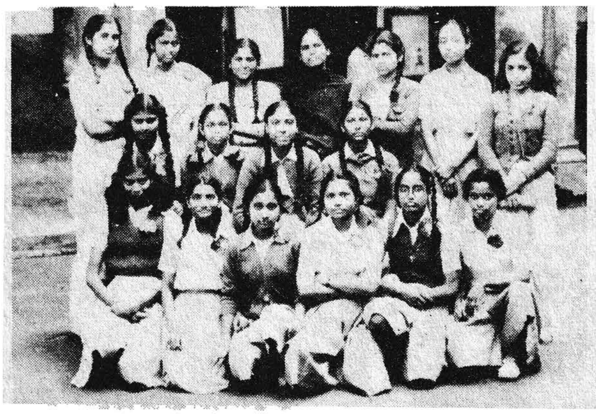

আদি মহাকালী পাঠশালার খেলাধূলার কৃতী ছাত্রীরা

আদি মহাকালী পাঠশালা উত্তর কলকাতার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী স্কুল। এই স্কুলের ছাত্রীরা পড়াশুনার সঙ্গে খেলাধূলাতেও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। এই স্কুলের ছাত্রীরা খেলাধূলাতে খুবই উৎসাহী। এথলেটিক্স, ব্যাডমিণ্টন, খো-খো, কবাডী ও সাঁতারে এই স্কুলের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এথলেটিক্সে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট ইণ্টার স্কুল প্রতিযোগিতাতে এই স্কুলের ছাত্রীরা যোগ দেয়। এবং বহুবার বহু ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে ভাল পারফরমেন্স দেখিয়েছে। ৮১ ও ৮২ সালে এই স্কুল ইণ্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ান হয়। ৮৬তে এই স্কুলের দশম শ্রেণীর দুই ছাত্রী স্বপ্না মল্লিক ও সুমিতা নান যথাক্রমে লংজাম্প ও রানিং-এ প্রথম হয়। এরা দুজনেই চুঁচড়োতে জোনাল ওয়াইজ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ পায় কিন্তু পরীক্ষার জন্য সেখানে তারা যেতে পারেনি। এই স্কুলের অপর এক ছাত্রী সীমা মজুমদার ক্যাডবেরি আয়োজিত এথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয় পর পর চারবার এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দিল্লী যায়। সেখানে দুইবার সীমা প্লেস পায়।

এই স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে এথলেটিক্সে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হলো—বন্দনা ব্যানার্জী, মৌসুমী চৌধুরী, স্নিগ্ধা কবিরাজ, স্বপ্না মল্লিক, লালি দত্ত, তৃপ্তি হালদার, নিবেদিতা, মৌসুমী দাঁ।

খো-খো/কবাডী

খো-খো ও কবাডীতে এই স্কুলের ছাত্রীরা ইণ্টার স্কুল প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। কবাডীতে চ্যাম্পিয়ান হয় ৮১তে। রানার্স হয় ৮৫তে। খো-খোতে এই স্কুল চ্যাম্পিয়ান হয় ৮৫তে। রানার্স হয় ৮২তে। খো-খোতে স্কুলের ছাত্রী শম্পা দে ও সোমা বসু স্টেটে পারটিসিপেট করেছে ৮৬তে। এরা ছাড়া গোপা, স্নিগ্ধা কবিরাজও খো-খোতে উল্লেখযোগ্য নাম। কবাডীতে এই স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপ্তি হালদার, স্নিগ্ধা, শম্পা, লালি দত্ত, গোপা।

ব্যাডমিণ্টন

এই স্কুলের ছাত্রীরা ৮১ সাল অবধি ইণ্টার স্কুল ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যোগ দিতো। বর্তমানে কয়েক বছর যাবৎ ছাত্রীরা যোগ দিচ্ছে না। বর্তমানের ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাডমিণ্টনে উল্লেখযোগ্য নাম হলো—সোমা ঘোষ, নিবেদিতা দাঁ, মৌসুমি দে, সোমা চক্রবর্তী, দীপ্তি হালদার।

সাঁতার

এই স্কুলের ছাত্রী লীনা মিত্র সাঁতারে ইণ্টার স্কুল প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ১০০ মি., ২০০ মি. ব্যাকস্ট্রোকে। লীনা ন্যাশানালে যায় এবং সেখানেও প্রথম হয়, এবং স্কলারশিপ পায়। ৮৬তে ইণ্টার স্কুল মিটে এই স্কুলের কাকলি মন্ডল ড্রাইভিংএ প্রথম হয়। কাকলি অমরাবতীতে ন্যাশানালেও যায়। এছাড়া পাপিয়া ভট্টাচার্য, পিয়ালি ও সংগীতা এরা তিনজন আজাদ হিন্দ বাগে মুক্ত জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৮৬তে পাপিয়া 50 মি. ফ্রি স্টাইল, ব্যাকস্ট্রোক ও বাটার ফ্লাই দুটো ইভেণ্টে প্রথম হয়। বাকি দুজন একটি করে ইভেণ্টে প্রথম হয়।

এই স্কুলের ছাত্রীরা গত বছর ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া দিবসে যোগ দেয়। ১৫টি সিলেক্টেড স্কুলের মধ্যে এই স্কুলও আছে এবং তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ২000 টাকা উপহার পায়।

এই স্কুলের গেমস টিচার তপতী মিত্র জানালেন যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় খেলাধূলার বিষয়ে ভীষণ উৎসাহী। এঁরা সর্বদাই সহযোগিতা করেন। তবে মাঠের বড় অভাব। এছাড়া সরকার থেকে সামান্য কিছু সাহায্য আসলেও তা মোটেই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধূলায় কৃতী কয়েকজন ছাত্রী—শম্পা দে, কাকলি মন্ডল, পাপিয়া ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা কবিরাজ, দীপ্তি হালদার ও সোমা দে।

ছবি : সুজিত ভট্টাচার্য

ব্রুস লি

ডিভোনো ও ম্যাটেরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাই তো ! আমাদের এই লড়াইয়ের দৃশ্যে দেখছি নতুন একজন এসেছে ! তার মানে আমাকে এক-সঙ্গে তিনজনের মোকা-বিলা করতে হবে !
ব্রুস আমরা শূটিং শুরু করছি। এই তোমার নতুন স্টান্টম্যান, ডন।
লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে....হুঁ চিনতে পেরেছি।
হ্যালো, লি !
আমি ওর সঙ্গে কাজ করবো না মার্টিন !
কি... কিন্তু...
ছবিতে আমি স্টান্ট এক্সট্রা হিসেবে আমার ছাত্রদেরই ব্যবহার করি। কারণ অ্যাকশান সিনগুলো ওরা ঠিকঠাক ভাবে করতে পারে।
আমি মিঃ পার্কসকে বিশ্বাস করি না !
এই ছবিতে তোমার কোনো মতামত নেই লি। আমি এখানে এসেছি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অ্যাসোসিয়েটসের স্বার্থ রক্ষা করতে !
ব্রুস, পার্কসকে নিয়ে আমাদের কাজ করতেই হবে। ফ্রেড হোভিকেও ঠিক একই ভাবে আমার ওপর চাপানো হয়েছিলো....
তুমি কি চাওনি ফ্রেড, 'কল অফ ডেথ' লিখুক ?
DIST. BY ASIA FEATURES
না ! ও জঘন্য স্ক্রিন রাইটার। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস ওকে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। বাধ্য হয়েই মেনে নিয়ে-ছিলাম !
SHARMAN DiVONO and FRAN MATERA
ঠিক আছে মার্টিন, আমি অভিনয় করবো।
...আমি দেখতে চাই —ব্যাপারটা কোনদিকে গড়ায়।

[চলবে]

অমৃতের পুত্র

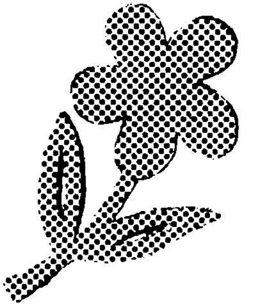

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রাখাল ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, তাকে কাঁদতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন পাঠশালার গুরুমশাই। যতই তিনি রাখালের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন, কি হলো, তুই কাঁদছিস কেন, ততই যেন বাড়তে থাকে রাখালের কান্না।

গুরুমশাই বিপদে পড়ে যান। গাঁয়ের জমিদার আনন্দমোহন ঘোষের ছেলে রাখাল। তার জন্যই জমিদারবাবু বসিয়েছেন এই পাঠশালা। এখন সে যদি কাঁদতে থাকে তাহলে যে পাঠশালাই উঠিয়ে দেবেন জমিদারবাবু। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, গুরুমশাই রাখালকে মারা দূরে থাক মুখেও কিছু বলেননি। তাই ঘাবড়িয়ে যান আরো বেশি।

রাখাল অবশ্য মোটেই আর পাঁচটা জমিদারের ছেলের মতো নয়। পড়াশোনায় সে রীতিমত ভালো। গুরুমশাই তাকে বকার সুযোগই বড় একটা পান না। অথচ কেন যে রাখাল কাঁদল তাই বুঝে উঠতে পারেন না।

রাখালকে না মারলেও গুরুমশাই এতক্ষণ রাগের মাথায় বেদম পেটাচ্ছিলেন একটি ছেলেকে। তার দুষ্টুমির ঠেলায় তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। নিজে তো পড়বেই না, অন্যকেও পড়তে দেবে না। তার ওপর এটা ওটা দুষ্টুমি তো আছেই। কয়েকদিন ধরে দেখে দেখে গুরুমশাই সেদিন বেতখানা নিয়ে সপাসপ চালাতে থাকলেন ছেলেটির ওপর।

অবাক কান্ড, ছেলেটি কাঁদার আগেই ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করল রাখাল। তাই মার থামিয়ে গুরুমশাই এগিয়ে এলেন তার কাছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন তার কান্নার কারণ। ফোঁপাতে ফোঁপাতে রাখাল বলে, আপনি ওকে মারছিলেন কেন ? কাউকে মারতে দেখলে আমার যে বড় কষ্ট হয়।

এতক্ষণে হাসি ফোটে গুরুমশাইয়ের মুখে। ও, এই কথা। এই ফেলে দিলাম আমি বেত। কি এবার খুশি তো!

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চিকচিক করে ওঠে রাখালের মুখ। কান্না থামিয়ে মাথা নাড়ে সে। পাঠশালার ছেলেরাও এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল সব। অন্যকে মারলে কেউ এমন করে কাঁদে নাকি! রাখালকে কান্না থামিয়ে হাসতে দেখে এবার তাদের মুখেও হাসি ফুটল। তার কারণ, গুরুমশাই বেত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ওটা মাঝে মাঝে তাদের পিঠেও পড়ে।

সত্যি সত্যি সেদিন থেকে বসিরহাটের শিকরা গাঁয়ের সেই পাঠশালায় বেত মারা বন্ধ হয়ে গেল।

জমিদারের ছেলে কাঁদল বলে নয়, অন্যর ব্যথায় যে কেউ কাঁদতে পারে নিজের চোখে সেটা দেখার পরই গুরুমশাই চিরদিনের জন্য হাতের বেতকে তুলে রাখলেন ঘরের মাচায়।

কথায় বলে না, ভোরের আকাশ বলে দেয় সারাটা দিনের খবর। তেমনি রাখালের এই ছেলেবেলা দেখেই অনেকে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান, এ ছেলে বড় হয়ে একজন বড় মানুষ হবেই। হয়েও ছিল তাই। বড় হয়ে রাখাল হন সন্ন্যাসী। নাম হয় তাঁর স্বামী ব্রহ্মানন্দ। জগতের মানুষের দুঃখ–কষ্ট দেখলে কেঁদে উঠত তাঁর মন। সেই দুঃখ দূর করার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন একবারে হৃদয় উজাড় করে। সে অবশ্য অন্য কাহিনী। আমরা বরং শুনি স্বামী ব্রহ্মানন্দর সেই ছেলেবেলার কথা–যখন তিনি শুধুই রাখাল।

বড় হয়ে রাখাল যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান তখন তাঁকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠেছিলেন, রাখাল, আমার ব্রজের রাখাল।

সত্যিই তিনি ছিলেন রাখাল। ছোটবেলায় রাখালের শরীরটা ছিল নরম তুলতুলে। তার ওই নধরকান্তি দেখে পাড়ার মেয়েরা তাকে খুবই ভালবাসত। সবাই তাকে কোলে কোলেই রাখত। যার বাড়িতে যা থাকত তাই খেতে দিত তাকে।

আর রাখালও তেমনি। জমিদারের ছেলে হলেও সাধারণের কাছে যেতে তার এতটুকু আপত্তি নেই, বরং তাতেই সে যেন বেশি করে আনন্দ পায়।

ছোটবেলায় পাড়ার মেয়েরা ঝুঁটি বেঁধে দিত রাখালের আর মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, কোমরে, পেটে, গলায় হার আর হাতে বালা পরে রাখাল যখন মেয়েদের হাততালির সঙ্গে সঙ্গে নাচত তখন মেয়েদের সে কি আনন্দ। তারা হুল্লোড় করে বলে উঠত, রাখাল আমাদের সত্যিকারের কেষ্ট ঠাকুর। কেমন কেষ্ট ঠাকুরের মতো নাচছে দেখ।

পাড়ার মেয়েদের সেই হাসির সঙ্গে যোগ দিতেন মা কৈলাসকামিনী দেবীও। মা ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। দিনরাত্তির তিনি শুধু পুজো নিয়েই থাকতেন। এই পুজো করেই তিনি পেয়েছিলেন, তাই নাম রেখেছিলেন তার রাখাল। বলতেন, ওই আমার কৃষ্ণঠাকুর।

বছর পাঁচেক বয়স তখন রাখালের। মারা গেলেন মা কৈলাসকামিনী দেবী। ওইটুকু ছেলে রাখাল–কাছ থেকে দেখল মৃত্যুকে। সেই দেখা তাকে করে তুলল গম্ভীর। অন্তর্মুখী।

নির্জনতা পেয়ে বসল তাকে।

বাবা আবার বিয়ে করলেন। বিমাতা এসে কাছে টেনে নিলেন রাখালকে। জমিদার বাড়ির দিনগুলো আবার চলতে লাগল সেই আগের মতোই। একজনের মনের বীণায় যে লেগেছে একটু ভিন্ন সুর সেটা তেমন নজর করল না কেউ।

বাচ্চারা সবাই খেলে, খেলতে যায় রাখালও। সবাই খেলে হা-ডুডু-ফুটবল। রাখালের কিন্তু ও সব খেলা ভালো লাগে না। গ্রামের খেলা টুকিপাটি কিংবা নাদন এইসবই তার প্রিয় খেলা। রাখালের কিন্তু কুস্তি আর ব্যায়াম করতে ভাল লাগত। আর ভাল লাগে গান। মা কৈলাসকামিনী পুজোর সময় গান গাইতেন গুনগুন করে। বাড়িতে আসত যেসব বৈরাগী তারাও গাইত নানারকম কীর্তন, শ্যামাসংগীত। ছোট্ট রাখাল সেইসব গান শুনে শুনে তুলে নিত তার গলায়। যেমন কীর্তন তেমনি শ্যামাসংগীত। দু'রকম গান গাইতে গাইতেই বিভোর হয়ে যেত সে। বন্ধুদের সংগে আড়ালে আবডালে সেইসব গান গাইতে গাইতে সে হারিয়ে ফেলত বাইরের সংগে সবরকম যোগ।

দিন যায়। বয়স বাড়ে। রাখালের এখন পড়াশোনা শুরুর সময়। কথাটা বাবা আনন্দমোহনকে মনে করিয়ে দিতেই তিনি বলেন, ভাল কথা, রাখালকে এবার তাহলে পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হোক।

কিন্তু পাঠশালা কোথায়? রাখাল কি তবে ভিন গাঁয়ে পড়তে যাবে?

অসম্ভব। আমার ছেলে পড়তে যাবে কিনা অন্য গাঁয়ে? তাও কখনও হয়?

তবে?

পাঠশালা বসল সেই এই শিকরা গ্রামেই। সেইখানেই পড়া শুরু করল রাখাল—সেই সংগে দুঃখু ঘুচল গাঁয়ের ছেলেদেরও। বর্ষার দিনে কিংবা গরমের মধ্যে তাদের আর অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয় না পাঠশালায়। তাই খুশি সবাই। রাখালের ভাগ্যেই সবার ভাগ্য খুলল। আদর বাড়ল আরো রাখালের।

রাখালের পড়ার ইচ্ছে, তার নানারকম প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যেতেন গুরুমশাইও। অনেক ছেলে তিনি পড়িয়েছেন, পড়াচ্ছেন—কিন্তু এমন ছেলে তিনি আগে দেখেননি। তিনি বলতেন আনন্দমোহনবাবুকে, ওইটুকু বাচ্চা ছেলের মধ্যে যে এত জ্ঞানের তৃষ্ণা থাকতে পারে তা আপনার রাখালকে দেখার আগে আমি জানতামই না। দেখে নেবেন, আপনার এ ছেলে একদিন বিরাট হবে—দেশের দশের একজন হয়ে উঠবে ও—নাম রাখবে এই গাঁয়ের।

মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে আনন্দমোহনবাবু কপালে দুহাত ঠেকিয়ে বলতেন, আশীর্বাদ করুন পন্ডিতমশাই, তাই যেন হয়।

পাঠশালায় পড়াশোনা চলে ওদিকে বোধনতলায় চলে খেলা। বাড়ির পাশেই পুকুর। পুকুরপাড়ে কালীবাড়ি আর

তারই পাশে বোধনতলা। পুজোর সময়টা ছাড়া এলাকাটা থাকে নির্জন। তাই ওই জায়গাটাই রাখালের সবচেয়ে বেশি পছন্দ। কখনও একা একাই সে ওইখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত সেদিকে হুঁশ থাকত না তার। একসময় বাড়ির লোকজন খুঁজতে খুঁজতে হাজির হতো সেখানে। দেখত চোখ বুজে বসে আছে রাখাল।

আবার কখনও বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে রাখাল এখানে খেলত পুজো পুজো খেলা। এই খেলাটাই ছিল তার সব খেলার চেয়ে প্রিয় খেলা।

বোধনতলায় বন্ধুদের নিয়ে এসে রাখাল নিজেই মাটি দিয়ে গড়ত কালীমূর্তি। তারপর সেই মূর্তির সামনে নিজে বসত পুজো করতে। পুজারী বামুনদের মতো ঘর থেকে পরে আসত কাপড়। আসনে বসে অনেকক্ষণ ধরে চলত তার পুজো।

একসময় শেষ হতো পুজো। তখন বলি, কচু গাছ কেটে এনে তৈরি হতো পাঁঠা। সেই পাঁঠা বলি দিত বন্ধুদেরই কেউ। আবার কখনও সে বন্ধুদের কাউকে বলত, এই এখন তুই পুজো কর, আমি বলি দেব।

বন্ধুরা হয়ত বলত, সে কিরে, পুরুত ঠাকুর কি কখনও বলি দেয় নাকি?

কেন? এখন তো আমি আর পুরুত ঠাকুর নই। এইতো এবার আমি কামার হয়েছি—এবার আমিই বলি দেব। বলেই

রাখাল খেলার খড়্গটা নিয়ে দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠত 'জয় মা কালী, পাঁঠাবলি' তারপরই বলত, ঘ্যাচাং। বেশ সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠত। শেষ হতো পুজো।

মাঝে মাঝে রাখাল একা একা কৃষ্ণের পুজো করত। তখন সুর করে গাইত কীর্তন। তার দু চোখ দিয়ে তখন গড়িয়ে পড়ত জল।

অবশ্য শুধু কীর্তন গাইবার সময় নয়, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলেই তার চোখ ফেটে জল আসত। আর ওইসময়ই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসত যেন আরেক রাখাল। বিশেষ করে গরিব-দুঃখীরা যখন বড়লোকের অত্যাচারে কষ্ট পেত তখন ছোট্ট রাখাল গর্জে উঠত প্রতিবাদে। এ ব্যাপারে সে বাবা জ্যাঠা কাউকেই ছেড়ে কথা বলত না। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বাড়িতে যে অশান্তি হতো না তা নয়, কিন্তু অন্যায় দেখলে তা চুপচাপ মেনে নেবার কথাটা ভাবতেই পারত না রাখাল।

সেবার এই নিয়ে হয়ে গেল একটা কান্ড। বাড়িতে তার এক জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইয়ের মায়ের শ্রাদ্ধ। প্রচুর লোক খাবে। চলছে তার এলাহি আয়োজন।

ভারে ভারে জিনিস দিয়ে যাচ্ছে প্রজারা। কিন্তু কেমন যেন ব্যাজার মুখে। বিশেষ করে গোয়ালাদের দেখে রাখালের যেন বড় কষ্ট হলো। বাঁকে করে দুধ, ক্ষীর, দই দিয়ে যাচ্ছে তারা, কিন্তু মুখে হাসি নেই—বরং কেমন যেন কষ্ট কষ্ট ভাব। এমনকি রাখালের সংগেও আজ তারা হেসে কথা কইছে না। অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে শেষে রাখাল একজনকে জিজ্ঞেসই করে ফেলে, কি হয়েছে গো, তোমরা এমন শুকনো মুখে জিনিস দিয়ে যাচ্ছ কেন?

বুড়ো মতো এক গোয়ালা বলে ওঠে, মুখে হাসি আসবে কি করে খোকাবাবু?

কেন?

কেন বুঝতে পারছ না? কত জিনিসের জোগান দিতে হচ্ছে আমাদের! আমরা গরীব মানুষ—আমরা মিনিমাগনা জিনিসগুলো দিই কি করে বলত?

মিনি মাগনা দিচ্ছ কেন?

ওরে বাবা, না দিয়ে উপায় আছে? কে জমিদারবাবুর হুকুম অমান্য করবে?

ওই ছোট্ট বয়সেও রাখাল যেন বুঝতে পারে সব। বুঝতে পারে গরীব প্রজাদের ওপর এটা রীতিমত অত্যাচার। সংগে সংগে ফুঁসে ওঠে তার ভেতর ঘুমিয়ে থাকা আরেকটা রাখাল। সে গিয়ে হাজির হয় জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

কাজের মধ্যেও জ্যাঠামশাই তার দিকে তাকিয়ে বলেন, কিরে রাখাল, কিছু বলবি?

জিজ্ঞেস করছিলুম, এটা কার শ্রাদ্ধ হচ্ছে?

রাখালের প্রশ্নের মুখে কেমন যেন থতমত খেয়ে যান জ্যাঠামশাই। তিনি বলেন, কি বলছিস রে তুই। তুই কি জানিস না যে তোর ঠাকুমার শ্রাদ্ধ।

জ্বলে ওঠে রাখালের চোখ, তবে কেন প্রজাদের দিতে হচ্ছে সব জিনিসপত্র? এতে কি আপনার মা'র আত্মার কল্যাণ হবে মনে করেন?

চমকে ওঠেন জ্যাঠামশাই। তাঁর মুখের ওপর যে এত বড় কথাটা বলতে পারল এইটুকু ছেলে তাতে তাঁর বিস্ময় যেন ছাপিয়ে গেল তাঁর রাগকে। তিনি প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠেন, কি বলছিস কি তুই?

এভাবে গরীব প্রজাদের মেরে পুণ্য অর্জন না হয় নাই করতেন?

রাখালের সেই তীব্র ভর্ৎসনার মুখে দাঁড়াতে পারেন না বলেই জ্যাঠামশাই এবার ধমকে ওঠেন, বড্ড ডেঁপো হয়েছিস দেখছি। যা এখান থেকে, এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখের ওপর সেদিন আর কিছু বলতে পারেনি রাখাল। প্রজাদের জন্য বুকভরা বেদনা নিয়ে সেখান থেকে চলেই গিয়েছিল সে।

ব্যাপারটা কিন্তু ওইখানেই থেমে থাকেনি। জ্যাঠামশাই রাখালের বাবা আনন্দমোহনকে ডেকে বেশ দু চারটে কড়া কথাই শুনিয়ে দেন। রাগে আনন্দমোহন এসে রাখালকেই ধমক দেন। রাখাল সেদিন বুঝতে পারেনি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় কেন উল্টে তাকেই বকুনি খেতে হলো? বুঝতে না পারলেও, মনে মনে সেদিনই ঠিক করে ফেলে, যে জমিদারি মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে দেয় না তার সংগে সম্পর্ক রাখবে না সে কোনোমতেই। মনে মনে সেদিন থেকেই রাখাল চলে এসেছিল নিপীড়িত মানুষের পাশে।

গাঁয়ের পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ হবার পরই বাবা তাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। রাখাল এসে উঠল তার সৎভাইদের মামার বাড়িতে। ভর্তি হলো ট্রেনিং আকাদেমিতে, তার বয়স তখন বারো।

কলকাতায় এসে কিছুদিন রাখালের অবস্থা হলো যেন জলের মাছকে ডাঙায় তোলার মতো। কিছুতেই যেন নিজেকে আর সবার সংগে মানিয়ে নিতে পারে না। নতুন স্কুলে বন্ধুবান্ধব জুটল তার অনেকেই, কিন্তু কারো সংগেই সে যেন প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। খেলতেও ভাল লাগে না।

তবে খুব বেশিদিন তাকে ওইভাবে কাটাতে হয়নি। স্কুলের পাশেই ছিল একটা ব্যায়ামের ক্লাব। বরাবরই আর সব খেলার চেয়ে ব্যায়ামের দিক ঝোঁক ছিল তার বেশি, তাই ক্লাবের নাম শুনে ভর্তি হয়ে গেল সে এখানে।

এই ক্লাবেই পাশের সিমলেপাড়া থেকে বেশ কিছু ছেলের সংগে আসত নরেন—পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ। নরেন রাখালের চেয়ে একটু উঁচু ক্লাসে পড়লেও বয়সে ছিল মাত্র ৯ দিনের বড়। নরেনের জন্ম কলকাতার সিমলে পাড়ায় ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি আর রাখালের জন্ম ওই একই বছরের ২১ জানুয়ারি বসিরহাটের শিকরা গ্রামে। তাই এই দু'টি একবয়সী

ছেলের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে বেশি দেরি হলো না। নরেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে রাখালের জীবনেও এল একটা পরিবর্তন। কলকাতা এখন আর তার কাছে তেমন নির্বান্ধব পুরী নয়।

নরেন মসজিদবাড়িতে অম্বিকা গুহর আখড়ায় কুস্তি শিখতে যায়, রাখালও ভর্তি হলো সেই আখড়ায়। নরেন ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে—রাখালেরও ভাল লাগে তাই। স্কুলের ছুটির পরই তারা চলে যায় ঘোড়ায় চড়তে।

নরেন আর রাখাল যে ঘোড়াটায় চড়ত তার নাম ছিল পেগু। সাদা ধবধবে বর্মী টাট্টু। সে এক মজার ছবি। কেউ ধরেছে ঘোড়ার লেজ, কেউ কান বা ঝোটন আবার কেউ ধরেছে নাক। তারপর সবাই মিলে রাখালকে চাপিয়ে দিচ্ছে সেই ঘোড়ার পিঠে। বেঁটে মোটা রাখাল গম্ভীরভাবে সেই ছোট্ট টাট্টুতে চড়ে যখন যাচ্ছে তখন কি ফূর্তি সবার। হৈ হৈ করতে থাকে সবাই।

রাখাল এখন নরেনকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। গলায় গলায় ভাব কিন্তু সব কিছুতে রাখাল যেন নরেনকে তার গুরু মেনে বসে আছে। নরেন যা বলে, যা করে—তাতেই তার মত। নরেন ব্রাহ্ম সমাজে যায়—রাখালও তাই। দুজনেই একসঙ্গে সমাজের প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করল তারা কখনও আকার মানবে না, নিরাকারের সাধনাই হবে তাদের ব্রত।

এদিকে নরেনের সঙ্গে এত মেলামেশা, পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিনরাত্তির এই যে ধর্ম নিয়ে আলোচনা এসব রাখালের বাড়ির লোকের তেমন ভাল লাগে না। তাই ১৬ বছর বয়সেই তাঁরা বিয়ে দিয়ে দেন রাখালের। বিয়ে হয় রাখালের মামারবাড়ির প্রতিবেশি মনমোহন মিত্রের বোনের সঙ্গে।

এই বিয়ের ফলেই কিন্তু রাখালের জীবন এবার বইল অন্য খাতে। তার তখন ১৮ বছর বয়স। সেইসময় এই মনমোহন মিত্রই তাকে নিয়ে যায় দক্ষিণেশ্বরে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাকে দেখেই ঠাকুর বুঝতে পারেন—এই সেই ছেলে যাকে কয়েকদিন মা কালী তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এই তোর ছেলে। ভাবে দেখা সেই ছেলেকে সামনে পেয়ে ঠাকুর আহ্লাদে একবারে আটখানা। তিনি রাখালকে বলেন, এসেছ, বেশ করেছ—আবার এস।

তারপর? তারপর প্রায় নিত্যই সেখানে আসে রাখাল। নরেনেরও আসা শুরু হয়ে গেছে ততদিনে। দুজনকেই ভালবাসেন ঠাকুর। কিন্তু রাখাল যেন তাঁর ছোট ছেলেটি। নিজে ঘোড়া হয়ে তিনি রাখালকে তাঁর পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ান—ঘোড়া ঘোড়া খেলেন। রাখালও কিছু না ভেবেই বসে পড়ে ঠাকুরের কোলে।

ঠাকুর যখন দেহত্যাগ করেন তখন রাখালের বয়স মাত্র ২৩। কিন্তু তারি মধ্যে সংসারে অরুচি ধরে রাখালের। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে আশ্রয় নেয় বরাহনগর মঠে। নরেনের সঙ্গে সন্ন্যাস নিয়ে রাখাল হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দই হন রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের প্রথম সভাপতি।

ডানপিটে ভগবান

নটরাজন

শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলার রোমাঞ্চকর কাহিনী।
গল্প, উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়।
দামঃ দশ টাকা মাত্র।

কমল লাহিড়ী
ভক্তের ভগবান (১ম খণ্ড) ৭·০০
(২য় খণ্ড) ৮·০০

ছোটদের পদ্মাপুরাণ
সুনির্মল বসু
ছোটদের জন্য পুরাণের গল্প। যেমন সুন্দর তেমনি আকর্ষণীয়। দামঃ আট টাকা মাত্র।

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী ৯·০০
গল্পে বিবেকানন্দ ৯·০০ শ্রীমা ৬·০০
গল্পে নিবেদিতা ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
ছোটদের রামায়ণ ৫·০০

পুস্তক তালিকার জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন কি একটা কাজে বাবলু আর বিলু গিয়েছিল হাজার হাত কালীতলায় ওদের এক বন্ধুর বাড়ি। ফেরার পথে গদাধর মিস্ত্রী লেনের সবুজতীর্থ নার্শারি স্কুলের কাছে এসে একটা জটলা দেখে ওরা সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। কি ব্যাপার? একটু আগে টিফিনের সময় স্কুলের খেলার মাঠ থেকে একটি মেয়ে চুরি হয়ে গেছে।

খুবই রহস্যময় চুরি। পাঁচ বছরের মেয়ে। প্রকাশ্য দিবালোকে মেয়েটি স্কুলের মাঠ থেকে হারিয়ে যাবার নয়। তার কারণ, পাড়ার ভেতরে স্কুল। চারিদিকে লোকজন। বিশেষ করে টিফিনের সময় সব শিশুরই বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসে খাবার নিয়ে। অথচ তারই ভেতর থেকে চুরি হয়ে গেল মেয়েটি।

স্কুলের সামনের মাঠে নানা লোকের জটলা। বাবলু সাইকেলটা বিলুর জিম্মায় রেখে ভিড় ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে। চারজন শিক্ষিকা এবং দুজন পরিচারিকা ম্লান মুখে বসেছিলেন সেখানে।

বাবলু ভেতরে ঢুকে বলল—যদি কিছু মনে না করেন তো দু'একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাদের?

—কে তুমি?

—আমি বাবলু। এই এলাকার কাছাকাছিই থাকি। আমি পান্ডব গোয়েন্দাদের একজন।

পরিচয় পেয়ে চিনতে পারলেন দিদিমণিরা। বললেন—ও, তুমিই বাবলু? তা পারবে ভাই তোমার দলবল নিয়ে মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে? নাহলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না কারো কাছে। আসলে টিফিনের সময় সব ছেলে-মেয়েরই বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসেন বলে আমরা একটু নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু এমন যে হবে তা কে জানে?

বাবলু বলল—থানায় খবর দিয়েছেন?

—হ্যাঁ। পুলিশ হয়তো এখুনি এসে পড়বে।

—আপনাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত?

—এ বছর একশো ষাটজন। এর মধ্যে এগারো জন আজ অনুপস্থিত ছিল।

—মেয়েটির বয়স?

—পাঁচ বছর।

—একেবারেই শিশু। কি নাম ওর?

—প্যাসিফিক দত্ত।

—অদ্ভুত নাম তো? উচ্চারণ করতে পারে?

—পারে।

—এই মেয়েটির বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে কে এসেছিল?

—এর বাড়ি থেকে সব দিন টিফিন নিয়ে কেউ আসে না। তবে আজ ওর মাসী এসেছিল। খাইয়ে চলে গেছে। তারপরই নিখোঁজ মেয়েটি।

বাবলু বলল—ওর মাসীকে একবার ডাকাবেন ভেতরে? আমি তাঁর সঙ্গেও একটু কথা বলে নিতাম।

এমন সময় বাইরে শোরগোল উঠল। পুলিশ এসেছে। বাবলুদের অপরিচিত একজন নতুন এস. আই. মেয়েটির মাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর বললেন—বাইরের লোক এখানে কেউ ভিড় করবেন না। যে যার বাচ্চাদের নিয়ে চলে যান। আমাকে আমার কাজ করতে দিন।

এ কথায় কাজ হলো। অনেকেই চলে গেলেন যে যার ছেলে-মেয়ে নিয়ে। শুধু পাড়ার কিছু উৎসাহী লোক স্কুলের গন্ডীর বাইরে ভিড় করে রইলেন।

বাবলু দেখল ঘাড় অব্দি চুল একটি কিশোরী মেয়ে দরজার কাছে বিবর্ণ-মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বাবলুরই বয়সী। পরনে স্কার্ট। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। চমৎকার মুখশ্রী। নিশ্চয়ই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির বাড়ির কেউ। বাবলু এগিয়ে গিয়ে বলল—শুনুন।

মেয়েটি একবার চোখ তুলে তাকাল। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল।

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। মেয়েটি বাবলুকে ফালতু ছেলে মনে করে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

বাবলুও ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

পুলিশের এস. আই. তখন ভেতরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। বাবলুকে দেখেই বললেন—আমি না বারণ করেছিলাম এ সময় ভেতরে কেউ আসবে না। যাও বাইরে যাও।

বাবলু বলল—এই মেয়েটির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।

—তার মানে?

অপহৃতা মেয়েটির মা বললেন—কে রে কুসুম? ছেলেটিকে চিনিস তুই?

—না দিদি।

একজন শিক্ষিকা বললেন—তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো। ও পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু। খুব ভালো ছেলে। হয়তো ওর দ্বারাও আমাদের উপকার হতে পারে।

তরুণ এস. আই. বিস্মিত হয়ে বললেন—ও, এই সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা?

—হ্যাঁ।

কুসুমও হাসিমুখে বলল—তাই ভালো। আমি ভেবেছিলাম কে না কে!

বাবলু বলল—আপনি একটু বাইরে আসবেন? আমি দু'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব শুধু।

কুসুম বাইরে এসে একটি বেঞ্চিতে বসে মুখটা করুণ করে বলল—আমাকে আপনি বলবার দরকার নেই। তুমিই বলবেন। আপনারা তো অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। তা পারবেন আমার বোনঝিকে উদ্ধার করতে?

—চেষ্টা করব। তার আগে আমার দু'একটা কথার উত্তর দাও তো।

—কি কথা, বলো?

—তুমি যখন তোমার বোনঝিকে টিফিন দিতে এলে তখন সেখানে কে কে ছিল?

—কেউ না। শুধু তুলতুলি আর টুং নামে দুটি মেয়ের সঙ্গে খেলছিল। অন্যান্য মেয়েদের বাড়ির লোকেরা অবশ্য ছিল সেখানে। আর কাউকে তো দেখিনি। আমি খাবার খাইয়ে চলে আসতেই ও তুলতুলি আর টুংএর সঙ্গে খেলতে লেগে গেল।

—ঐ মেয়ে দুটোর বাড়ি তুমি চেনো?

—হ্যাঁ। ওরা তো দু'বোন।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারবে সেখানে?

—পারব।

—চলো তো দেখি।

বাবলু ইশারায় বিলুকে ডেকে সাইকেল নিয়ে কুসুমের সঙ্গে মেয়ে দুটির বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে কুসুম বলল—এই ছেলেটি কে? তোমার ভাই বুঝি?

—ভাইয়েরই মতো। ও আমার দলের ছেলে। ওর নাম বিলু।

কুসুম মুখে হাসি এনে বলল—ও আচ্ছা আচ্ছা।

বেশ কয়েকটি বাড়ির পরেই একটি বাড়ির সামনে এসে থামল কুসুম। তারপর ডাকল—মায়াদি! এই মায়াদি।

—কে?

—আমি কুসুম। একবার তুলতুলি টুংকে আসতে বলবে? পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুদা কি জিজ্ঞেস করবে ওকে।

মায়াদি দরজা খুলে দিতেই তুলতুলি, টুং ছুটে এলো। বাবলু তুলতুলিকে কোলে নিয়ে বলল—আচ্ছা, তুলতুলি বলো তো তোমাদের নার্শারি স্কুলের প্যাসিফিক মেয়েটি কেমন?

তুলতুলি একগাল হেসে বলল—খুব ভালো মেয়ে। তবে কি জানো, প্যাসিটা না বড্ড হ্যাংলা। রোজ আমার কাছ থেকে লজেন্স বিস্কুট চেয়ে খায়।

—শুধু তোমার কাছেই চায়?

—না, সবার কাছেই চায়। কেউ কিছু খেলেই ও বলে এই একটু দিবিরে?

—ও কাউকে কিছু দেয় না?

—ও কিছু আনেই না তো দেবে কি?

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল—একি শুনছি কুসুম? একটি ছোট শিশুকে স্কুলে পড়তে পাঠাচ্ছো তোমরা অথচ তাকে খুশি করার কোনো ব্যবস্থা করো না? কেন একটি শিশুকে সামান্য লজেন্স বিস্কুটের জন্য অন্য শিশুর কাছে হাত পাততে হয়? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। খুবই লজ্জার কথা।

কুসুম মাথা হেঁট করল।

বাবলু তুলতুলিকে আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা বলো তো দেখি তোমরা যখন খেলছিলে তখন তোমাদের কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকছিল কিনা?

—হ্যাঁ। সেন্টুমামা এসে সবাইকে চকোলেট দিচ্ছিল। আমার তো অনেক আছে আমি তাই নিইনি।

তুলতুলির বোন টুং বলল—ছেনতুমামা আমাকেও দিচ্ছিল। আমিও নিইনি। আমার বাবা আমাদের বলে দিয়েছে বাইরের লোকে কিছু দিলে একদম নিবি না। কারো কোলে যাবি না।

বাবলু বলল—ওরে বাব্বা। তা প্যাসি কি বলল?

তুলতুলি বলল—প্যাসি সেন্টুমামার কোলে উঠে বলল,

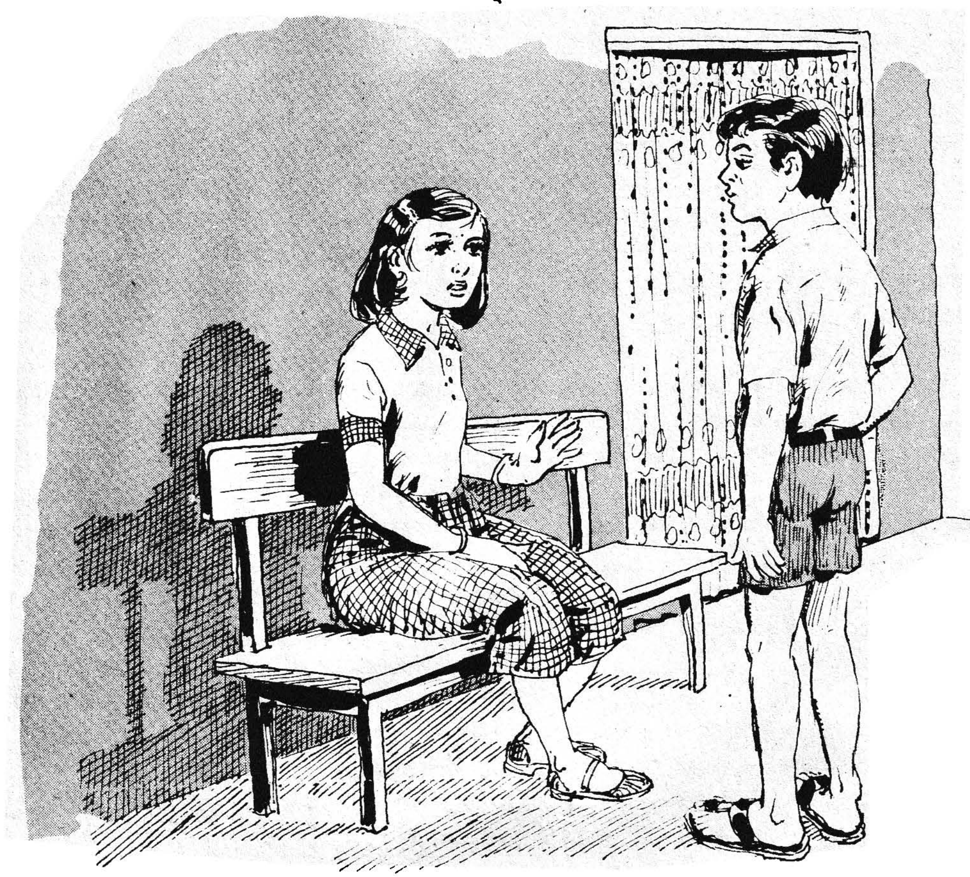

–তুমি যখন টিফিন দিতে এলে তখন সেখানে কে কে ছিল ?

সেন্টুমামা আমাকে কোয়ালিটি আইসক্রিম খাওয়াবে ? সেন্টুমামা বলল, খাওয়াবো। আমার সঙ্গে আয়। বলে ওকে নিয়ে চলে গেল।

বাবলু কুসুমকে বলল–সেন্টুমামা কে !

কুসুম বলল–কি জানি ? প্যাসির তো কোনো মামা নেই। আমরা তিন বোন। বড়দি, মেজদি আর আমি। প্যাসি আমার মেজদির মেয়ে।

–বড়দি কোথায় থাকেন ?

–বড়দি বাইরে থাকেন।

বাবলু বলল–বুঝেছি। আমাদের এখনই এই সেন্টুমামাটিকে খুঁজে বার করতে হবে। তা প্যাসির কোনো ছবি আমাদের দিতে পারো কুসুম ?

–পারি। বাড়িতে এসো।

বাবলু বিলু কুসুমের সঙ্গে বাড়িতে গেল। তারপর প্যাসির একটি ছবি নিয়ে সেটি বুক পকেটে রেখে ফিরে এলো নিজেদের আস্তানায়। ওদের মনে এখন একটাই চিন্তা কে এই সেন্টুমামা !

ঘরে ফিরে বাবলু বিলুকে বলল–খুব গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে। তুই চট করে স্নান খাওয়া সেরে এখানে চলে আয়। তাড়াতাড়ি করবি কিন্তু। নাহলে মেয়েটাকে পাওয়া যাবে না।

বিলু বলল–এই সময় ভোম্বলটাও যদি থাকত।

–ও কবে আসবে বলেছে কিছু ?

–কে জানে ? সেই যে গেছে তা প্রায় এক হপ্তা হয়ে গেল। এখনো ফেরার নাম নেই। অদ্ভুত ছেলে একটা। কোথাও খাবার গন্ধ পেলে আর ওকে সেখান থেকে নড়ানো যাবে না।

–তুই তাহলে বাচ্চু বিচ্ছুকে খবরটা দিয়ে চলে আয়।

বিলু চলে যেতেই বাবলু ভেতর ঘরে ঢুকে মাকে বলল–মা ! আমাকে খুব তাড়াতাড়ি খেতে দাও তো। আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে ফেলি।

–কেন রে, কোথায় যাবি ?

–তা জানি না। তবে একটা জটিল কাজে জড়িয়ে পড়েছি। কি যে হবে তা জানি না।

–কি হলো আবার ?

–নার্শারি স্কুলের একটি বাচ্চা মেয়ে টিফিনের সময় চুরি হয়ে গেছে আজ।

–ওমা ! সেকি !

–যে ভাবেই হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে মা।

–আহা। কার বাছারে। দেখ' বাবা দেখ। যেভাবেই হোক মা'র বাছাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে এনে দে।

মায়ের কথা শুনে বাবলু অবাক হয়ে গেল। কেন না এই প্রথম কোনো একটি কাজে উৎসাহ দিলেন মা। নাহলে এ যাবৎ যে কাজ করতে গেছে বাবলুরা সবেতেই ভয় পেয়েছেন আর বাধা দিয়েছেন।

বাবলু খুব ব্যস্ততার সংগে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিল। তারপর খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েই কি যেন ভাবতে লাগল নিজের মনে।

এমন সময় দরজায় খট্‌খট্‌।

বাবলু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই বিলু ভেতরে ঢুকল।

–বাচ্চু বিচ্চু কই?

–ওরা নেই।

–সেকি! কোথায় গেছে?

–হলদিয়ায়। কাল রাত্রে ওর ছোটমামা এসেছিল, তার সংগেই চলে গেছে। ফিরতে কাল সন্ধ্যেবেলা।

–সব দিক দিয়েই গণ্ডগোল দেখছি এবারে। যাক, এখন যা করবার তা আমাদের দুজনকেই করতে হবে। এই বলে বাবলু আর বিলু ঘরের দরজা বন্ধ করে প্যাসিফিকের ছবিটা নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে ওর মুখটা এঁকে নিল মনের ক্যানভাসে।

বিলু বলল–এই মেয়েটির ব্যাপারে তুই কি কিছু চিন্তা ভাবনা করেছিস?

–না। তার কারণ আমাদের প্রথমেই জানতে হবে এই সেণ্টুমামাটি কে? কি রকম দেখতে। বয়স কত? এবং কতদিন যাওয়া আসা করছে এখানে।

–কিন্তু কুসুম যে বলল ওর কোনো মামা নেই।

–না থাকতে পারে। আর কারো তো আছে। সেটাই খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। দরকার হলে স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর বাড়িতে যাবো আমরা। এই বলে বাবলু অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। কে এই সেণ্টুমামা? স্থানীয় কেউ নিশ্চয়ই। নাহলে তুলতুলি তাকে চিনত না। হঠাৎ কি ভেবে বাবলু বলল–আমার সংগে একবার আয় তো বিলু।

–কোথায়?

–তুলতুলিদের বাড়িতে যাবো একবার। বলেই ঘর থেকে সাইকেলটা বার করে জোরে হাঁক দিল বাবলু–পঞ্চু! পঞ্চু! কাম হিয়ার।

পঞ্চু কোথায় ছিল কে জানে! ছুটতে ছুটতে এসে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

–আমরা একটু বেরোচ্ছি। হয়তো আবার একটা অভিযানে যেতে হবে আমাদের। তৈরি থাকিস।

পঞ্চু মাথা নেড়ে জানাল 'ভৌ ভৌ'। অর্থাৎ সবই বুঝে গেছে সে।

বাবলু বিলুকে ওর সাইকেলের সামনের দিকে বসিয়ে খুব জোরে প্যাডেল করে তুলতুলিদের বাড়িতে এলো। দরজায় কড়া নাড়তেই তুলতুলির মা সাড়া দিল–কে!

–আমি বাবলু। একবার দরজাটা খুলুন না বৌদি।

তুলতুলির মা দরজা খুলেই ভয়ে ভয়ে বলল–কি হয়েছে? আবার এলে যে?

–একবার তুলতুলিকে ডেকে দিন না।

–ও আসবে না। এখন ঘুমোচ্ছে।

–আমাদের বিশেষ দরকার।

–কোনো দরকারেই তোমরা আর এ বাড়িতে এসো না, আমরা এ সবের ভেতরে নেই। বলেই দড়াম করে মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজাটা।

বাবলু আর বিলু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

এমন সময় পাশের বাড়ির এক গিন্নী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন–আর বলো না বাবা। একটু আগে যে কাণ্ড হয়ে গেল। তোমরা চলে যাবার পরই কোথা থেকে চাপ দাড়ি একটা ছেলে এসে শাসিয়ে গেছে 'মেয়েকে সাবধানে রাখবেন। তোতা পাখির মতো গড়গড় করে নাম-টাম বললে একদম হজম করে দেবো। আর ঐ পাণ্ডব গোয়েন্দা ছেলেদের সংগে একদম কথাবার্তা বলবেন না। পুলিশকেও কিছু না। বুঝেছেন?' তা এর পরে আর কি কেউ এইসব ঝামেলায় থাকে বাবা?

এই কথা না শুনেই বাবলু আবার তুলতুলিদের দরজায় ধাক্কা দিল– বউদি শীগগির দরজা খুলুন। একদম ভয় পাবেন না। আমরা বলছি কোনো ভয় নেই আপনাদের।

ভেতর থেকেই উত্তর এলো–বলছি তো কোনো ব্যাপারে নেই আমরা।

–আপনি কোনো ব্যাপারে না থাকলেও এখন কিন্তু পুরো-পুরিভাবে এই ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। যেভাবেই হোক সেণ্টুমামা নামের ছেলেটি জানতে পেরেছে আপনার মেয়ে তার নামটা ফাঁস করে দিয়েছে। অতএব আর আপনার ভয় কি? তাই বলি আপনি সহযোগিতা করুন আমাদের সংগে। নাহলে আমরা তো পুলিশকে জানাবোই, তখন কিন্তু পুলিশের জেরার উত্তর দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।

এবার দরজা খুলল।

তুলতুলির মা বলল–কি জ্বালা ভাই। কি যে করি এখন?

–কি আবার করবেন? তবে যতদিন না ঐ মেয়েটাকে আমরা উদ্ধার করতে পারি ততদিন আপনার মেয়েদের ঘর থেকে বার করবেন না, এমন কি স্কুলেও পাঠাবেন না ওদের। এখন বলুন তো এই যে চাপ দাড়ি ছেলেটা আপনাকে এসে শাসিয়ে গেছে ওকে আপনি চেনেন কিনা?

–না। তবে মাঝে মধ্যে ওকে ঐ স্কুলের ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তাও রোজ নয়। কখনো-সখনো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও খুব ভালবাসত। লজেন্স দিত।

সবাই ওকে সেন্টুমামা বলে ডাকত। আমি ভাবতাম ঐ পাড়ারই কারো বাড়ির ছেলে বুঝি, কিন্তু কে জানত ভাই যে ও একটা ছেলে-চোর।

—ছেলে ছেলে করছেন, ওর বয়স কত?

—তা ধরো না কেন, ত্রিশ বত্রিশ তো হবেই।

—ব্যস। আর জানার কিছু নেই। এখন বলুন তো ঐ কুসুম মেয়েটি কি রকম?

—তা কি করে বলব ভাই? স্কুলেই আলাপ। একবার ওর দিদির সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল অনেকদিন আগে। ও তো থাকে না এখানে। ওর বাবা রেলে চাকরি করেন। ঝাঁঝায় থাকে ও।

—ঠিক আছে আমরা আসছি। বলেই বিলুকে নিয়ে সোজা চলে এলো প্যাসিদের বাড়ি।

প্যাসির মায়ের সঙ্গেও একবার কথা বলা দরকার।

দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল—কে?

—আমরা।

প্যাসির মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে—কি চাই তোমাদের?

—আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছি। আচ্ছা বউদি, সেন্টুমামা কে? ঐ নামের কাউকে আপনি চেনেন? দেখেছেন কখনো?

কই না তো?

একটি বছর দেড়েকের ফুটফুটে শিশু তখন গুট গুট করে হেঁটে এসে বাবলুর দিকে তাকিয়ে কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর মা বলল—বাবাই দুষ্টুমি করো না।

বাবলু শিশুটিকে কোলে নিয়ে তাকে সস্নেহে চুমু খেয়ে বলল—বেশ সুন্দর ছেলে তো। কোনো ভয় নেই। কেমন সহজেই কোলে এলো।

ওর মা বেশ প্রসন্ন হয়েই বলল—ও সবার কোলে যায়। খুব আমুদে। আমার মেয়েও তাই ছিল।

—আপনার বোন কোথায়? কুসুম।

—সে চলে গেছে।

—চলে গেছে? কখন?

—সকালেই গেছে। তোমরা চলে যাবার পরেই। যা এখানকার ব্যাপার স্যাপার। আমিই পাঠিয়ে দিলাম তাই। দুদিন বাদে আমরাও দুর্গাপুরে চলে যাবো। এখন ভালোয় ভালোয় মেয়েটাকে ফিরে পেলে হয়।

—আপনার বোন কোথায় গেছে বউদি?

—বাড়ি চলে গেছে।

—তার মানে ঝাঁঝায়?

—যেখানেই হোক। তোমরা এখন যাও তো দেখি। একে মন-মেজাজের ঠিক নেই তার ওপর এর বাবা যে কবে আসবে দুর্গাপুর থেকে তা কে জানে? পুলিশে তো খবর দিয়েছি। দেখি, এখন কি হয়।

বাবলু আর বিলু হতাশ হয়ে ফিরে এলো। তবে বাড়িতে নয় মিত্তিরদের বাগানে।

আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছি

সেখানে এসে দেখল সেই ভাঙা বাড়িতে ভোম্বল একা একা চুপচাপ বসে আছে। আর পঞ্চু ঘোরাঘুরি করছে চারিদিকে।

বাবলু বিলু অবাক হয়ে বলল—কি ব্যাপার ভোম্বল! তুই কখন এলি?

—অনেকক্ষণ এসেছি। বাড়িতে এসেই শুনলাম তোরা নাকি খোঁজ করেছিস। তাই চলে এলাম। তোর মা বললেন, কি একটা মেয়ে চুরির ব্যাপারে...।

—হ্যাঁ। বেশ রহস্যময় চুরি। এবং সন্দেহজনক ব্যাপার। এই বলে ভোম্বলকে সব কথা খুলে বলল বাবলু। তারপর বিলুকে বলল—বিলু তুই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস?

—কি?

—একটি শিশু চুরি গেল। তার মা পুলিশে খবর দিলেন। দারুণ উত্তেজনা। কিন্তু চোখে জল নেই। মেয়েটির মাসী, বেদনায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে ভাবটা এই, অথচ কাঁদছে না। সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হলো তুলতুলি আমাদের কাছে সেন্টুমামার নাম বলল, কিন্তু সে খবর সেন্টুমামা জানতে পারল কি করে? সেখানে তুই আমি কুসুম ছাড়া আর কেউ তো ছিল না। আরো মজার ব্যাপার, আমরা যখন প্যাসিদের বাড়িতে গেলাম তখন ওর মায়ের কোন হা-হুতাশের ব্যাপার দেখলাম না। বরং দেড় বছরের বাবাই যে সবার কোলে গিয়ে আদর খেতে ভালবাসে সেটা বেশ আনন্দ করেই বলল। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা সেটা হলো, এই রকম একটি ঘটনার পর আজই কুসুম চলে গেলো কেন?

বিলু প্রায় লাফিয়ে উঠল—সত্যিই তো। তুই ঠিকই বলেছিস বাবলু। এই দিকগুলো তো আমি ভাবিনি।

—তার ওপর মেয়েটির বাবা দুর্গাপুরে আছেন। তাঁকে একটা টেলিগ্রামও করা হয়নি।

—কি করে জানলি?

—করলে তো শুনতামই। মেয়েটির মা কি বলল শুনিসনি? এর বাবা কবে আসবে কে জানে? এর দ্বারা কি মনে হয় তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?

—না।

—আমার মনে হয় মেয়েটিকে অপহরণ করানো হয়েছে। এবং তা এদেরই কারসাজিতে।

—তা কি করে সম্ভব!

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল—এ ছাড়া আর কি ভাবতে পারি বল? গোলমালটা এইখানেই। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আজ থেকেই ঐ বাড়িটার দিকে নজরদারি করা। সন্দেহজনক কাউকে ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখলেই তাকে অনুসরণ করব আমরা।

ভোম্বল বলল—হ্যাঁ, তাই করব।

বাবলুর কথা মতো ঠিক সন্ধ্যের পরই ওরা তিন জনে প্যাসিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে ঘুট ঘুট করছে চারিদিক। ওরা টর্চের আলো ফেলেই দেখল দরজায় তালাচাবি। ব্যাপার কি?

বাবলু পাশের একটি বাড়িতে নক করতেই এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন—কে গা বাছা?

অন্ধকারে বাবলু নিজের পরিচয় না দিয়েই জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা মাসীমা, বলতে পারেন আপনাদের পাশের বাড়ির এরা কোথায় গেছে?

—না বাবা। তোমরা কোত্থেকে আসছ?

—আমরা শিবপুর থেকে আসছি। শুনলাম এদের একটি মেয়ে সকালে হারিয়ে গেছে তাই খোঁজ নিতে এসেছি। মেয়েটিকে পাওয়া গেছে কি জানেন?

—না বাবা। পায়নি। যে দিনকাল পড়েছে। এই বাজারে ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেলে কি পাওয়া যায়? আহা, মা-মরা মেয়ে। কোথায় যে গেল!

বাবলুর আশঙ্কা যে এমন নির্মম সত্য হবে তা সে ভাবতেও পারেনি। বলল—মা-মরা মেয়ে মানে?

—ও বাবা, তা জানো না বুঝি? প্যাসি তো নিজের মেয়ে নয়। সতীনের। বউমার ঐ একটিই মাত্র ছেলে, বাবাই। প্যাসির মা মরে যেতে ওর বাবা এই মেয়ের দেখাশোনার জন্যে ফের বে করে। মেয়ে অন্ত প্রাণ। ওর বাপ ফিরে এসে শুনলে হার্টফেল করবে।

—ওর বাবা খবর পেয়েছে?

—কে খবর দেবে বাবা?

—আচ্ছা, ওঁর এক বোন এসেছিল না?

—হ্যাঁ। সেও তো সকালেই পালিয়েছে। বোনে বোনে কি ঝগড়া। একদম মিল নেই। ঝগড়ার পরই চলে গেছে।

—আর বউদি?

—কি জানি বাবা। বলতে পারব না। আসলে পাড়ায় কারো সঙ্গে ওদের বনিবনা নেই। আমরাও কথা বলি না। বড় মুখরা মেয়েমানুষ। ঐটুকু বাচ্চাকে কি মারই না মারত। আদ্দেক দিন ইসকুলে পাঠাতো না, পাঠালেও টিফিন দিত না। ওর বাপ থাকলে নিজে গিয়ে দিয়ে আসত।

বাবলু বলল—আচ্ছা এদের সেন্টুমামা নামে কেউ আছে বলে জানেন?

—না বাবা। বলতে পারব না।

হতাশ বাবলুরা ফিরে এলো বাড়িতে। মা জিজ্ঞেস করলেন—কিরে কিছু হলো?

—না মা। কোনো হদিশই পেলাম না।

বাবলু বিলু আর ভোম্বল তিনজনেই ওদের বৈঠকখানা ঘরে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। আর পঞ্চু করল কি একটা টেবিলের ওপর শুয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এমনভাবে দেখতে লাগল ওদের যেন সেও ভাবছে এবারের আসন্ন লড়াইয়ে ওকে ঠিক কিভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

[চলবে]

ছবি : দিলীপ দাস

অঙ্ক জগতের জাদু

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

লাল-কালোর ম্যাজিক

জাদুকর এক প্যাকেট তাস থেকে জোকার দুটো বাদ দিয়ে বাকি তাসগুলো দর্শকদের ভালভাবে মিশিয়ে দিতে বললেন। অর্থাৎ বাহান্নখানা তাসের মধ্যে কোনো সাজানো হিসেব ইত্যাদি কিছুই রইলো না। জাদুকর এবারে একজন দর্শককে বললেন সেই প্যাকেট থেকে একজোড়া একজোড়া করে তাস একসাথে নিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করতে। তবে হ্যাঁ, সেই ভাগ করবার মধ্যে একটা শর্ত আছে, আর তা হলো–যদি জোড়াটায় দুটোই লাল তাস থাকে তো তাহলে সেটা একদিকে রাখতে হবে–আর যদি দুটোই কালো তাস হয় তো তাহলে সেটা যাবে অন্য দিকের ভাগে। কিন্তু যদি জোড়াতে একটা লাল এবং একটা কালো তাস থেকে থাকে তো তাহলে সেই জোড়াটাকে আমাদের ম্যাজিক থেকে বাদ দিতে হবে। পুরো ব্যাপারটাই করতে হবে জাদুকরের চোখের আড়ালে। শর্ত অনুযায়ী দর্শক পুরো প্যাকেটের লাল জোড়াগুলোকে একদিকে আর কালো জোড়াগুলোকে অন্যদিকে রেখে দুটো ভাগ করলেন। লাল-কালো মেশানো জোড়া তাসগুলোকেও আলাদা করে রেখে বাদ দিয়ে দিলেন। তা যাই হোক, এবারে জাদুকর দর্শককে বললেন–ওই ভাগ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে তাঁর হাতে দিতে। ধরা যাক দর্শকেরা তাঁকে কালো জোড়ার ভাগটা দিলেন। তাসগুলো হাতে নিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে কী যেন একটা হিসেব করলেন। আর তারপর বললেন–ওই লালের অংশে এই কালো অংশের চেয়ে মোট দুটো তাস বেশি আছে। তাসগুলোকে সব গুনে দেখা হলো, অবাক ব্যাপার! সত্যিই এই কালো ভাগের চেয়ে লালের ভাগে দুটো তাস বেশি রয়েছে! না গুনে তিনি ঠিক ঠিক জবাব দিলেন কীভাবে? সবাই তো অবাক!

পুরো ব্যাপারটা অঙ্কের হলেও এতে সূক্ষ্ম হিসেব-টিসেব কিছু নেই। খেলাটা শুরু করবার আগে যখন জাদুকর জোকার দুটোকে বাদ দিচ্ছিলেন তখন অথবা তারও আগের থেকে তিনি ওই প্যাকেট থেকে দুটো কালো তাস বাদ দিয়ে রেখেছিলেন। এভাবে প্যাকেটে পঞ্চাশখানা তাস নিয়ে খেলাটা শুরু করলেন অর্থাৎ লাল জোড়া একদিকে, কালো জোড়া আর একদিকে, আর লাল-কালো মেশানো জোড়াগুলোকে একদম বাদ দিলে দেখা যাবে সেখানে যতোগুলো জোড়াই থাকুক না কেন, কালো জোড়ার অংশে লাল জোড়ার অংশ থেকে মোট দুটো কম তাস রয়েছে। বা অন্য কথায় কালো জোড়ার তাসগুলোকে গুনে তার সঙ্গে দুই যোগ করলে যোগফলটা হবে লাল জোড়ার তাসের সংখ্যার সমান। গাণিতিক কারণে নিজে নিজেই এটা ঘটছে।

ম্যাজিকটা কীভাবে হচ্ছে তার হিসেব নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। এক প্যাকেট তাসে জোকার বাদ দিলে মোট বাহান্নখানা তাস থাকে। সেই বাহান্নখানা থেকে আবার দুটো কালো তাস সরিয়ে রাখা ছিল। অর্থাৎ ওই প্যাকেটে আসলে মোট চব্বিশটা কালো আর ছাব্বিশটা লাল তাস রাখা ছিল। এবারে ওই প্যাকেট থেকে যখন জোড়ায় জোড়ায় তাস নিয়ে আলাদা করে ভাগ করা হচ্ছিল তখন ধরা যাক 'x' জোড়া তাস, লাল এবং কালোয় মেশানো হিসেবে বাতিল হয়ে গেছিল। অর্থাৎ ওই বাতিল অংশে মোট x সংখ্যক লাল তাস এবং সেই x সংখ্যকই কালো তাস ছিল। এবারে ভাবা যাক লালের জোড়া দিয়ে তৈরি ভাগে মোট 'A' সংখ্যক তাস ছিল। সুতরাং লালের হিসেব অনুযায়ী $A+x=26$ কারণ ছাব্বিশটা লাল তাস ওই প্যাকেটে ছিল।

বা $x=26-A$.......(i).

অন্যদিকে ধরা যাক কালো জোড়া দিয়ে তৈরি ভাগে মোট 'B' সংখ্যক তাস ছিল। সুতরাং কালোর হিসেব অনুযায়ী $B+x=24$. কারণ মোট চব্বিশটা কালো তাস ওই প্যাকেটে ছিল। বা $x=24-B$........(ii).

ওপরের হিসেব দুটো থেকে দেখা যাচ্ছে

$x=26-A$........(i)

আবার $x=24-B$........(ii)

অর্থাৎ $26-A=24-B$.

সমীকরণ করে পাচ্ছি $A=(26-24)+B.=B+2$.

অর্থাৎ সোজা কথায় 'A' বা লাল জোড়ার অংশে 'B' বা কালো জোড়া অংশ থেকে মোট দুটো তাস বেশি থাকবেই।

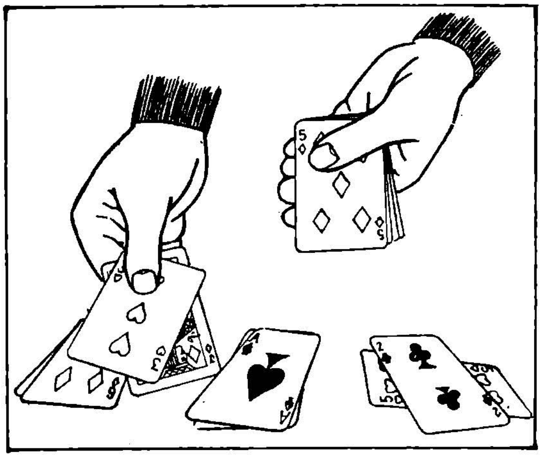

[চলবে]

মকরদ্বীপের রহস্য

রাধারমণ রায়

কালমকরের চিঠি

গণেশকাকু আমার বাবার বন্ধু। কাছেই থাকেন, সর্দার শঙ্কর রোডে। পেশায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার বাবাকে উনি দাদা বলে ডাকেন, আর বাবা ওঁকে ডাকেন নাম ধরে। আমি আর বুড়ি জন্মের পর থেকেই ওঁকে কাকু বলে জানি।

আমার বাবার নাম শ্রীপ্রভাতকুমার দাস। তিনি কাজ করেন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে। কিছুদিন হলো পোস্টিং পেয়েছেন গ্রেট নিকোবরে। কী একটা জরুরি কাজে তিনি গণেশকাকুকে সেখানে যেতে লিখেছেন। গণেশকাকুর বাড়ির নম্বরটা তাঁর জানা নেই, তাই আমাকে যে-খামে তিনি চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যেই গণেশকাকুর চিঠিটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিটায় লেখা ছিল:

প্রিয়বরেষু,

আশা করি কুশলে আছ। আমার শারীরিক অবস্থা মোটামুটি। তোমার বন্ধু বাসুদেব পাল নতুন কী বই লিখলেন?

কিছুদিন আগে তুমি আমায় লিখেছিলে, গ্রেট নিকোবরে বেড়াতে আসবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, এই চিঠি পাওয়ার সংগে সংগে রওনা হয়ে পড়। এখানে তোমার উপস্থিতি বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। গোয়েন্দাকে কেন আমাদের দরকার হয়, সেটা তুমি অভিজ্ঞতা দিয়েই ভাল জান বলে সব কথা ভেঙে লিখলাম না। তুমি এলে তোমার পথ-খরচা আমি দিয়ে দেব। তোমার বাড়ির নম্বরটা আমার জানা নেই বলে জিতের মারফত চিঠিটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলাম। এজন্যে মনে কিছু করো না।

শুভেচ্ছাসহ,
প্রভাতদা।

আমি তক্ষুণি চিঠিটা দিয়ে এলাম ওঁর সর্দার শঙ্কর রোডের পাঁচ নম্বর বাড়িতে গিয়ে। সে-সময় চিঠিটা পড়ে উনি বলেছিলেন, বিকেল চারটে নাগাদ উনি আমাদের বাড়িতে আসবেন।

উনি চারটের একটু আগেই এলেন মায়ের সংগে কথা বলতে। ওঁদের কথার মাঝখানেই আমি আর বুড়ি বায়না ধরি, গণেশকাকুর সংগে গ্রেট নিকোবর যাব বলে। আমার নাম জিৎ। আমার বোন বুড়ির ভাল নাম সোমা। আমি ওকে খুব ভালবাসি। কিন্তু সুযোগ পেলেই ওকে খুব খেপাই। ওর বয়স মাত্র দশ।

গণেশকাকুই আমাদের জন্য পারমিশন আনিয়েছেন। জাহাজের টিকিট বুক করেছেন। আমি আর বুড়ি দুজনেই তাই যাচ্ছি ছুটিতে বাবার কাছে বেড়াতে।

আজ বাদে কাল আমরা রওনা হব। এসব কথা বলতেই গণেশকাকু এলেন আমাদের বাড়িতে।

চেয়ার টেনে বসলেন গণেশকাকু। বাঁ হাতের কব্জী ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময়টা একবার উনি দেখে নিলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তোমরা দুজনেই পরশু আমার সংগে হর্ষবর্ধন

জাহাজে উঠছো ? এখন ব্যাপারটা পাকা বউদি ?'

মা বললেন–'আপনি বসুন, আমি ওদের টিকিটের টাকাটা নিয়ে আসি' বলেই মা টাকা আনতে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

খুশিতে বুড়ি গণেশকাকুকে বললো, 'আমি জাহাজের একটা ছবি এঁকেছি, দেখবে ?'

'জাহাজের ছবি! কই, নিয়ে এসো, দেখি।' বললেন গণেশকাকু।

বুড়ি ঘর থেকে চলে যেতেই গণেশকাকু আমাকে বললেন, 'তুমি ক্যামেরায় ছবি তুলতে পার তো ?'

আমি বললাম, 'পারি। গেল বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে বাবা আমাকে একটা "ক্লিক থ্রী" কিনে দিয়েছিলেন। তাতে অনেক ছবি তুলেছি।'

'ক্যামেরাটা সঙ্গে নিও। ফিল্ম না থাকলে আজই ফিল্ম কিনে নেবে। ভাল কথা, তোমার কোনো এক দাদু আন্দামানে চাকরি করতেন না ?'

মা এসময় টাকাটা নিয়ে বসবার ঘরে এলেন। আমার হয়ে মা-ই গণেশকাকুর কথাটার উত্তর দিলেন। বললেন, 'আমার মেসোমশাই নীলমণি সরকার আন্দামান-নিকোবরে পুলিসের চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর লেক প্লেসে বাড়ি কিনেছেন। কেন, তাঁর সঙ্গে কোনো দরকার আছে ?'

'দরকার একটু আছে।'

'তাহলে জিতের সঙ্গেই আপনি সেখানে যেতে পারেন।' বলেই মা এক বাণ্ডিল নোট গণেশকাকুর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

গণেশকাকু বললেন, 'এত দরকার নেই। আধ বাণ্ডিল হলেই চলবে। বেশি লাগলে দাদার কাছ থেকে চেয়ে নেব। তাছাড়া আমিও তো একেবারে বেকার নই।'

'আপনি বেকার নন জানি। আমাদের দেশে যারা গল্পের বইয়ের ডিটেকটিভ, তারাই শুধু দুহাতে পয়সা কামায়। কিন্তু সত্যিকারের ডিটেকটিভ হয়ে টিকে থাকতে শুধু আপনাকেই দেখছি। তাও হয়তো পারতেন না, যদি বিয়ে-থা করতেন,

কাবুলিওয়ালা আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল

কিংবা মাথার ওপর কোনো বোঝা থাকতো। নিন, ধরুন।' বলেই মা একরকম জোর করেই বান্ডিলটা গণেশকাকুর হাতে গুঁজে দিলেন। আমি জানি, ওই বান্ডিলটায় আছে একশটা নোট। প্রতিটি নোট দশ টাকার। তার মানে, মোট হাজার টাকা।

ভেতরের ঘর থেকে বুড়ি এসময় চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, আমার ছবির ফাইলটা পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছো?'

মা বললেন, 'আলমারির মধ্যে।'

'দিয়ে যাও।'

'তুই খুলে নে।'

'চাবি দেওয়া রয়েছে। তুমি দিয়ে যাও।'

'যত্ত সব ঝামেলা!' বলেই মা আবার ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।

এসময় কলিংবেলটা বেজে উঠলো। আমি উঠে গিয়ে বাইরের দরোজাটা খুলে দিতেই একজন মাথায় পাগড়ি বাঁধা ভীষণদর্শন কাবুলিওয়ালা আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল। আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে ফুটপাথের ধারে থেমে থাকা একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলো। ট্যাক্সিটাও ছেড়ে দিল মুহূর্তের মধ্যে। ব্যাপারটা আমার কাছে আরো রহস্যজনক মনে হলো, যখন খামের ওপর দেখলাম 'গণেশ হালদার' নামটা লেখা।

গণেশকাকুর চিঠি আমাদের বাড়ির ঠিকানায় কেন? তাহলে কি লোকটা জানতো, উনি এসময় আমাদের বাড়িতেই আছেন?

আমি গণেশকাকুর হাতে খামটা দিতেই উনি একটু অবাক হয়ে খামের ওপর নিজের নামটা দেখে নিলেন। তারপর খামটা খুলে তার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট বের করে পড়তে লাগলেন। আমি কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে একনজরে চিঠিটা দেখে নিলাম। গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা চিঠিটা এরকম—

ডিটেকটিভ গণেশ হালদার মহাশয়,

আপনি যদি নিজের ভাল চান, গ্রেট নিকোবরে আসবেন না। আমার নিষেধ যদি অগ্রাহ্য করেন, এই চিঠিটাকে আপনার মৃত্যুর নোটিস বলে জেনে রাখবেন। ইতি—কালমকর

কালমকর! সে আবার কে!! তাহলে আমার বাবা যে-রহস্যের কথা গণেশকাকুকে লিখেছেন, এই কালমকরই কি সে-রহস্যের নায়ক!!!

গণেশকাকু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর ছোটো গলায় বললেন, 'চিঠির কথা মাকে যেন বলো না। তাহলে উনি হয়তো ভীষণ ভয় পেয়ে যাবেন। ফলে তোমাদের যাওয়াটাও উনি নাকচ করে দেবেন।'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, কক্ষণো জানাবো না।

বুড়ি জাহাজের ছবিটা নিয়ে এসময় ঘরে ঢুকলো। গণেশকাকু চিঠিটা পাঞ্জাবির পকেটে চালান করে দিয়ে ছবিটা ওর হাত থেকে নিলেন। ছবিটার ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে তার তলায় লিখে দিলেন, 'চমৎকার হয়েছে! জাহাজের নাম দিচ্ছি এম.ভি. হর্ষবর্ধন। খিদিরপুর ডক থেকে এটা ছাড়বে ২১শে ডিসেম্বর, বেলা চারটেয়।—কালমকরের যম।'

বুড়ি অবাক হয়ে শুধোলো, 'কালমকর কে?'

গণেশকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কোনো রাক্ষস-খোক্কস হবে। তবে তার সঠিক পরিচয়টা আমার জানা নেই, জানতে হবে।' বলেই আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চোখ টিপলেন, যার অর্থ, আমি যেন একটু আগে পাওয়া কালমকরের চিঠির ব্যাপারটা চেপে থাকি।

বুড়ি গণেশকাকুর চোখ টেপার রহস্যটাও ধরতে পারলো না। তাই ও আবার শুধোলো, 'কালমকরের যম কে রে দাদা?'

'কালমকরের যম হচ্ছেন শ্রীমান গণেশ হালদার।' একটু থেমে ভেতরের দরোজার দিকে তাকিয়ে গণেশকাকু দেখে নিলেন, মা এ-ঘরেই আসছেন। মা এলে উনি আবার বললেন, 'বউদি, এখন উঠি। অনেকগুলো জরুরি কাজ সারতে হবে।' বলেই উনি উঠে পড়লেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে বলে উঠলেন, 'জিৎ, কাল সকাল আটটার মধ্যেই আমি এখানে আসছি। লেক প্লেসে তোমার পুলিস-দাদুর কাছে একবার যেতে হবে।'

আমি মুখ খোলার আগেই মা বললেন, 'ঠিক আছে, আসবেন। আমি টেলিফোনে মেসোমশায়কে বলে রাখবো, যাতে ও-সময় তিনি বাড়িতে থাকেন। জিৎ আপনাকে নিয়ে যাবে।'

'আজ বিকেলেই চলুন না।' বললাম আমি।

গণেশকাকু আমার কথার জবাবে একটা ছড়া বললেন,

কাজ যদি চাও,
সকালেই যাও
মজলিস চাও?
বিকেলেতে যাও
তাই কথা এই—
যাব সকালেই।

এরপর আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আমার কানের কাছে মুখ রেখে উনি চুপিচুপি বললেন—

কালমকরের ভয়
করতে হবে জয়।

গণেশকাকু চলে যাওয়ার পর বুড়ি আমাকে শুধোলো, 'কাকু তোর কানে কানে কী বলে গেলেন রে?'

আমি বুড়ির কথার কোনো জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগলাম, কে এই কালমকর? আর তখন যে-কাবুলিওয়ালাটা চিঠি দিয়ে গেল, সেই বা কে?

মকরদ্বীপের ইতিহাস

পুলিস দাদু… মা আগে থেকেই টেলিফোনে বলে

রেখেছিলেন বলে ওঁকে আজ সকালে বাড়িতে পেতে অসুবিধা হলো না আমাদের। না হলে আজ এসময় ওঁর থাকার কথা ছিল টালিগঞ্জে। সেখানে ওঁর মেয়ে-জামাই বাড়ি করছেন। রাজমিস্ত্রীর কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য প্রতিদিনই সকাল-বিকেল দুবার করে উনি সেখানে হাজিরা দেন। ওঁর মেয়েজামাই থাকেন হাসনাবাদ। জামাই সেখানকার বি.ডি.ও.। তাই বাড়ি তৈরির কাজকর্মের ভার পড়েছে এই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের ওপর।

আমাদের বসবার ঘরে বসিয়ে ভেতর বাড়িতে দু-কাপ চা আর এককাপ হরলিক্স্-এর কথা বলে এসে উনি বেশ খোশ-মেজাজে বলে উঠলেন, 'বলুন, মিস্টার হালদার, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

গণেশকাকু বললেন, 'আপনি তো বেশ কিছুদিন আন্দামান-নিকোবরে পুলিস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেছেন, নিকোবরে অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্টের পোস্টে ছিলেন চাকরি-জীবনের শেষ ক-বছর?'

'ছিলাম। ঠিকই শুনেছেন।' বলেই দাদু একটা চুরুট ধরালেন।

'সেখানকার, বিশেষ করে নিকোবর-গ্রুপের ক্রাইম সম্বন্ধে যদি দু-চার কথা বলেন, বড়ো উপকার হয়।'

'কেন, আপনি সেখানে ক্রিমিনাল ধরতে যাচ্ছেন নাকি?'

'ক্রিমিনাল ধরতে পারবো কিনা জানি না, তবে সেখানে যাচ্ছি। আর কালই।'

আমি বললাম, 'আমি আর বুড়িও যাচ্ছি। টিকিট কাটা হয়ে গেছে।'

দাদু বললেন, 'খুব মজা, তাই না? গ্রেট নিকোবরে যখন শোম্পেনদের পাল্লায় পড়বে, তখুনি শুরু হবে আসল মজাটা।'

'শোম্পেনরা বুঝি খুব ডেঞ্জারাস?' জানতে চাইলাম আমি

দাদু বললেন, 'আন্দামানের জারোয়াদের মতন গ্রেট নিকোবরের শোম্পেনরা তত ডেঞ্জারাস না হলেও ওরাও কিন্তু সভ্য মানুষদের পছন্দ করে না। তবে জারোয়া বা শোম্পেন না, ও-সব দ্বীপের প্রধান ভয় কিছু অদ্ভুত উপদেবতা।'

'অদ্ভুত উপদেবতা! আপনি কাদের কথা বলতে চাইছেন?' শুধোলেন গণেশকাকু।

'যাদের কথা বলতে চাইছি, তাদের কাউকেই আমি চোখে দেখিনি, অথচ তারা সেখানে আছে। মাঝে মাঝেই তারা এমন এক-একটা কান্ড ঘটিয়ে বসে, যা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলে মনে হয়। যেমন, একবার তারা একটা ঘাট থেকে নোঙর করা চারটে নৌকা ভাসিয়ে দিল সমুদ্দুরে। নৌকো চারটের একটারও খোঁজ পাওয়া গেল না। আর একবার মালবোঝাই একটা লঞ্চই গেল অদৃশ্য হয়ে, গ্রেট নিকোবরের জাহাজঘাটা থেকে।'

'লঞ্চে কোনো মানুষ ছিল না?' গণেশকাকুর প্রশ্ন।

'না, লঞ্চের সঙ্গে কোনো মানুষ অদৃশ্য হওয়ার খবর পাইনি।'

'আপনার মতে তাহলে এই দুটো ব্যাপারেই কোনো অদ্ভুত উপদেবতার অদৃশ্য হাত ছিল?'

'আমার মতে না, উপদেবতার কথা ওখানকার স্থানীয় লোকেরাই বলতো।'

'কালমকর নামে কোনো উপদেবতার নাম আপনার শোনা আছে?'

'কালমকর! তার কথা আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি আন্দামান নিকোবর সম্বন্ধে কিছু কথা জানার জন্য আপনার কাছে আসব ভেবেছিলাম, তখন কালমকরের কথাই আমি জানতাম না। এখন জেনেছি। যদি ওর সম্বন্ধে কিছু বলেন আপনি।'

ট্রেতে চা আর হরলিক্স্ নিয়ে এলো গৃহভৃত্য সুভদ্র।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দাদু শুরু করলেন, 'যে-ভাবেই হোক কালমকরের নামটা আপনার জানা হয়েছে। আপনি চাইছেন তার সম্বন্ধে ডিটেল জানতে। বেশ, শুনুন তাহলে। একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি। নিকোবর-গ্রুপে ক টা দ্বীপ আছে জানেন?'

গণেশকাকু বললেন, 'ভূগোলে পড়েছি, নিকোবর-গ্রুপে আছে মোট বাষট্টিটি দ্বীপ। এর মধ্যে কেবল বারোটিতে আছে লোকবসতি। বাকি পঞ্চাশটি দ্বীপ পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়।' বলেই উনি এক টিপ নস্যি নিলেন।

'গুড! যে পঞ্চাশটি দ্বীপ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তাদেরই একটির নাম মকরদ্বীপ।'

'মকরদ্বীপ! ওই নামে ওখানে কোনো দ্বীপ আছে বলে তো কোনো বইতে পড়িনি।'

'আরে রাখুন মশাই, বই! বই তো আপনার আমার মতন মানুষই লেখে। সেখানকার পরিবেশ, মানুষ আর তাদের সংস্কৃতির ওপর ক'জন লেখকের থরো নলেজ আছে বলতে পারেন?'

[চলবে]

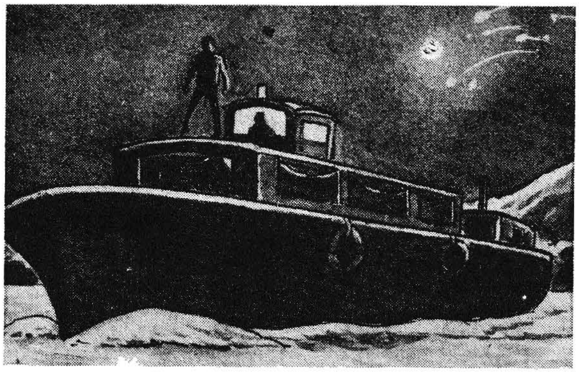

ছবি : নারায়ণ দেবনাথ

হাতে কলমে

চুপ! সার্কাস চলছে — ১

মাসীর বাড়ির বেল টিপতেই মাসী ছুটতে ছুটতে এসে বললেন–চুপ! একটাও কথা নয়, একদম হাসবে না। চুপচাপ আমার সাথে এসে বসে পড়। এখন সার্কাস চলছে।

–সার্কাস! বাড়ির মধ্যে সার্কাস! ব্যাপার কিছুই বোধগম্য হলো না। যাই হোক, দালানে ঢুকতেই ব্যাপারটা কিছুটা তরল হলো। দেখি দাদু-দিদা, মাসী-মেসো, রবি-আনু আরও দুচারজন বাচ্চা ছেলে গম্ভীর হয়ে মেঝেতে বসে। আর দিয়া তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সার্কাস দেখিয়ে চলেছে। আমি উপায় না দেখে মেসোর পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে বসলাম। মেসো নিচু গলায় আমায় বললেন, মনোযোগ দিয়ে দেখ–অমনোযোগী হলে হয়ত সার্কাসওয়ালার সম্মানহানি হতে পারে। শাস্তিস্বরূপ উনি হয়ত সারাদিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবেন।

যা হোক, সার্কাস যা দেখছি তাই বলি–

–এই আমার রামু হাতি (১) ও এই দড়ির (২) ওপর দিয়ে সাইকেল (৩) চড়ে একবার এদিকে যাবে আর একবার ওদিকে যাবে (ছবি নং ১)।

কি রামু, পারবি তো?

কেন, রামু পারবে না

▬ ▬ ▬ বিজ্ঞানে ভারকেন্দ্র বলে একটা কথা আছে তো। ভারকেন্দ্র ঠিক সাইকেলের চাকা বরাবর গেলেই বাজিমাৎ। আর দিয়া তাই করেছিল। একটা পিচবোর্ডের হাতি (১) কেটে নিয়ে [অবশ্য রামুর মাথায় একটা ছাতা (৪) দিয়ে] তাকে লাগিয়েছিল (ছবি নং ২) সাইকেলের (৩) আঁককাটা (ছবি নং ৩) একটা প্লাইউডের গাড়ির (৫) ওপর। ঐ সাইকেলটার (৩) হ্যাণ্ডেলের বদলে লাগিয়েছিল মোটা একটা তার (৬) অর্ধগোলাকৃতির। এই তারটার দুদিকে দুটো কাঠের বল (৭) গর্ত করে ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল। এই বল দুটোই (৭) ভারকেন্দ্রের স্থিরতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। নাইলনের সুতোটার একদিক দরজার কড়ায় বাঁধা, অপর দিকটা টান-টান করে ধরে রেখেছে দিয়া। আর তার পার্টনার রামু হাতিকে সাইকেলে চড়িয়ে সুতোর ওপর আলতো করে পুলী বরাবর বসিয়ে দিল। এবার সুতোটা ধরে দিয়া উঁচু নিচু করলেই 'রামু' একবার এদিক একবার ওদিক যাবেই।

....

••• (পরের সংখ্যায় সার্কাস–২)

এইভাবে একটা কাগজে ছক কেটে হাতি ও সাইকেল আঁকবে। তারপর মোটা পিচবোর্ডের টুকরোর ওপর জুড়ে কেটে নেবে। রঙ করলে দেখতে আরো সুন্দর হবে।

ছবি নং ২

১–হাতি।
২–সুতো।
৩–সাইকেলের আঁক
৪–ছাতা।
৬–লোহার U-আকৃতির তার।
৭–কাঠের বল।

ছবি নং ১

গণেশ ঘোষ
মদন মুখোপাধ্যায়

৫–প্লাইউডের/মোটা কার্ডবোর্ডের গাড়ি
৮–ছোট্ট পুলী (দুটো)

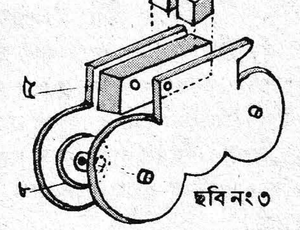

ছবি নং ৩

লেখা আছে পুঁথির পাতায়

ভরকেন্দ্র তাকেই বলে যে বিন্দু দিয়ে বস্তুর সমস্ত ভরকে পৃথিবী আকর্ষণ করে। সমতল পাতের ক্ষেত্রে যে বিন্দুতে চ্যাপ্টা পাতকে আনুভূমিক ভাবে ঝোলানো যায় (Balance) সেই বিন্দুই হলো ভারকেন্দ্র।

যেমন, বৃত্তাকার পাতের ভরকেন্দ্র হলো তার কেন্দ্রবিন্দু, বর্গাকার পাতের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু, কিন্তু অসমাকৃতি পাতের ক্ষেত্রে এই বিন্দু কোথায় থাকবে?

জ্যামিতিক ছকে না গিয়ে ভরকেন্দ্র বার করার উপায় আছে। কার্ডবোর্ডের একটা এরকম পাত (যেমন পাশের ছবিতে আছে) কেটে নাও। তারপর এর ধারের কাছাকাছি কোনো বিন্দুতে আলপিন গুঁজে, সাথে একটা ছোট ওয়াসারে সুতো বেঁধে ওলন তৈরি করে ঝোলাও। ওলন-রেখা কার্ডবোর্ডের টুকরোর যে স্থান দিয়ে গেল-সেই স্থান বরাবর একটা সরলরেখা টানো। এবার টুকরোটার অন্য এক বিন্দু দিয়ে ঝুলিয়ে একই ভাবে আর একটা সরলরেখা টানো। এই রেখা দুটো যে বিন্দুতে ছেদ করবে, টুকরোটার ভারকেন্দ্র সেটাই। কার্ডবোর্ডের টুকরোটা পেন্সিলে পেছনে ঐ বিন্দুতে ব্যালান্স করে দেখে নিতে পারো।

এবার চিন্তা করে দেখো, যদি ঐ সরলরেখা দুটো টুকরোটার মধ্যে কোনো বিন্দুতে ছেদ না করে তবে ভরকেন্দ্র কোথায় হবে?

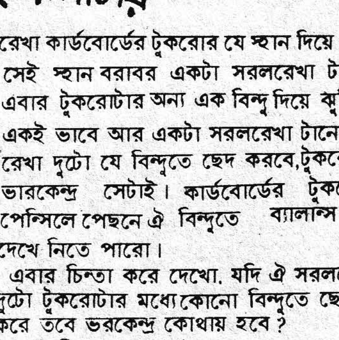

সুস্মিত পাল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

বাসা

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

পুরো দস্তুর কাজ শুরু হয়ে গেছে ওদের। বাসা তৈরি তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! কিন্তু কাজের মধ্যেও বাগড়া পড়েছিল। রাণীর জন্য একটা বাসা তৈরি করতে হবে। তারপর আর কি!

হাওয়ার দিন এলেই হাওয়া হয়ে যেতে হবে।

যাই হোক, প্রথম বাসাটা ওরা তৈরি করেছিল টুকাইদের বাড়ির ছাদের বীমটার নিচে। তাতেও কি রেহাই আছে! টুকাইটা ঠিক দেখে ফেলেছে। অমনি লাগিয়েছে মাকে। মা বলেছেন টুকাইয়ের বাবাকে। টুকাইয়ের বাবা অমনি কোথা থেকে একখানা জাঁদরেল চেহারার লোককে ধরে নিয়ে এলেন। আচ্ছা! লোকটার মনে কি মায়া-দয়া বলে কিচ্ছু নেই! কোথা থেকে একটা মই যোগাড় করে ঠিক চড়ে পড়ল আর ওর নাকটা গিয়ে ঠেকল একেবারে ওদের বাসাটার সামনে।

আর ওই রকম করে একগাদা ধোঁয়া কেউ দেয় নাকি!

কুটুসটা তো কাশতে-কাশতে সেই যে কোথায় উড়ে পালাল! তাররপ অবশ্য ওদের প্রত্যেককেই পালাতে হলো। সত্যি! টুকাইরা একদম বোঝে না। কত কষ্ট করে তৈরি করতে হয় বাসা। ওদের প্রত্যেকের ঘাম ঝরানো খাটুনি আছে ওর মধ্যে। ওদেরই চোখের সামনে কিনা লোকটা ভেঙে ফেলল বাসাটা!

মৌটুসি তো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

হুলফুটি বলে–দিই লোকটাকে হুল ফুটিয়ে! বুঝবে ঠ্যালা বাছাধন।

কাটুস বলে–না না, ওরকম করে কাজ নেই। আমরা আর ও-মুখো হব না। আমরা বরং সবাই মিলে আর একটা নতুন বাসা তৈরি করব। সেই যে গাঙ্গুলীদের আমবাগানে।

যাই হোক, গাঙ্গুলীদের আমবাগানে আমগাছের একটা ডালে কাজ শুরু হলো ওদের। সেই সক্কাল বেলায় বেরিয়ে পড়ে সবাই। পাড়ি দেয় বহুদূরে। সেই কেষ্ট বুড়োর গোলাপ, টগরের বাগানে যেতে হয় বৈকি! সারাদিনের পর রাতে শুধু একটু বিরাম। শীতের মিষ্টি রোদে কাজ করে চলে ওরা।

নিজেদের কাজ দেখে খুশি হয় নিজেরাই। আর সেখানে সবাই মিলে-মিশে কাজ করলে আনন্দ কার না হয়। সেদিন রঙ-বেরঙের জামা পড়ে শুঁড়ওয়ালা প্রজাপতিটা এসে বসে ছিল আমগাছের একটা ডালে ওদেরই বাসাটার সামনে। চুপটি করে বসে সে কাজ দেখছিল ওদের। দেখতে দেখতে হঠাৎ সে ওদের উদ্দেশে বলে বসে–আচ্ছা ভায়া, তোমরা সবাই মিলে এত বোকার খাটুনি খেটে মর কেন বল তো! আমরাও তো ভাই মধু খাই। ব্যস্ খাই-দাই আর ঘুরে বেড়াই। তোমরাও তো আমাদের মতো চলতে পার! দেখবে ঢের আনন্দ পাবে।

যেই না বলা অমনি কাটুসের কি রাগ। সে সাফ শুনিয়ে দেয়–দেখ ভায়া আমরা সবাই মিলে কাজ করে যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ হয়ত ছাড়াছাড়ি ভাবে কাজ করে আমরা পাব না। তাই এতেই আমাদের আনন্দ।

দিন যত এগোয় দেখতে দেখতে বাসাটা রসে টইটম্বুর হয়ে প্রকান্ড আকার নেয়। তখন কাটুস, কুটুস, হুলফুটি এবং মৌটুসির এবং অন্যান্যদের আনন্দ যেন আর ধরে না।

প্রজাপতিটা ওদের কান্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। সত্যি সবাই মিলে কাজ করে এত আনন্দ হয়। আমরাও তো ওদের মতো সবাই মিলে একটা বাসা তৈরি করতে পারি। ভাবতে থাকে প্রজাপতিটা।

ছবি : দিলীপ দাস

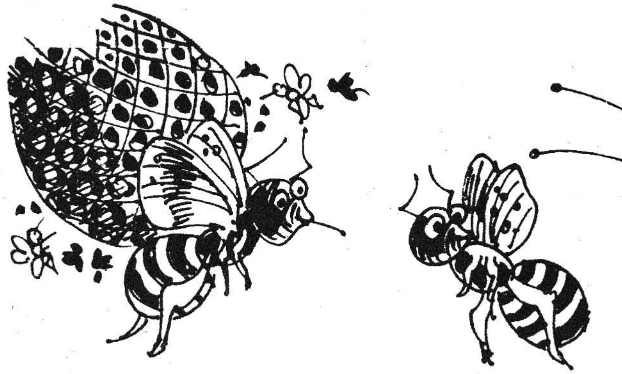

সুস্মিত পাল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

প্রাপ্তি

গার্গী সেন পুরকায়স্থ

পুজো এসে গেছে, মনের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করছিল পাপ্পুরা। এমন সময় সুবীর এসে বলল, তোরা সবাই নদীর পাড়ে এসে বসে আছিস আর আমি খেলার মাঠে তোদের খুঁজছিলাম।

পাপ্পু একটু রুক্ষস্বরেই বলে ওঠে, কেন কি হয়েছে? আমরা এখানে থাকবো না তো যাব কোথায়?

সুবীর বলল, তুই রাগ করছিস কেন? তোদের মতো আমাদেরও তো মন খারাপ। পুজো এসে গেছে অথচ আমাদের এই পাহাড় জঙ্গলে কোনো সাড়াই নেই।

পাহাড় জঙ্গলের কি দোষ বল? আমাদের বাপীরা এখানে চাকরি করেন। ওঁদের ছুটি নেই আর আমাদের স্কুলেও মাত্র দশ দিনের বন্ধ, এর পরেই পরীক্ষা। কোথাও যে যাব তার সুযোগ নেই।

নান্তুর কথায় সবাই ওর দিকে তাকালো। এতক্ষণে এদের কথাবার্তা শুনছিল দীপা। ক'দিন থেকে সে ভাবছে কিছু একটা যদি করা যায়। শুনেছে পাশের গ্রামে পাহাড় ধসে একমাত্র মানুষ চলাচলের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ঐখানে রাস্তার উপর থেকে বড় বড় গাছ পাথর মাটি এসব সরানোর কোনো ব্যবস্থাই নাকি এখনও হয়নি। ওদের বাড়িতে কাজ করে খেলমা নামে যে মিকির ছেলেটা সেই বলেছে ওকে। খেলমা ভাঙা ভাঙা হিন্দী ভাষায় কথা বলে। দীপ ওর বন্ধুদের বিমর্ষ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ নদীর দিকে ফিরিয়ে নিল। নদীর ঢেউগুলো দেখতে লাগলো পাহাড়ী নদীর জল কেমন পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। দীপের দিকে তাকিয়ে নান্তু বুঝেছে দীপ কিছু বলতে চায়, সে দীপের কাঁধে হাতের ঠেলা দিয়ে বলল, এই দীপ কিছু বলবি?

তোরা যদি রাজী থাকিস তবে একটা ভালো কাজ আমরা করতে পারি।

দীপের মুখের কথা শুনে সবাই ওর কাছে গিয়ে বসল।

এবার দীপ এদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, দেখ আমাদের তো পড়া ছাড়া আর কোনো কাজই নেই। আমাদের বাড়ির খেলমাকে তো চিনিস? সে বলেছে ওদের গ্রামের ভিতরে একটিমাত্র বড় রাস্তায় কিছুদিন আগে পাহাড় ধসে বন্ধ হয়ে আছে, এই রাস্তাটা শহরের দিকে গেছে। আমরা যদি খেলমাকে নিয়ে ওদের গ্রামে যাই আর স্থানীয় কিছু লোকের সাহায্য নিয়ে রাস্তাটা পরিষ্কার করে ফেলি তাহলে কেমন হয়?

প্রস্তাবটা তো খুবই ভাল। কিন্তু সমস্যা হলো ঠিক দুদিন পর পুজো, বাড়ি থেকে ওদের যেতে দেবেন কি না। তবু ওরা ঐখানে বসেই ওদের আগামীকালের যাওয়ার সবকিছু ঠিক করে নেয়। দা, ছুরি, কোদাল এগুলো নিজেদের বাড়ি থেকে নিলেই হবে।

পরদিন বাড়ি থেকে যাওয়ার ব্যাপারে মায়েদের অল্প আপত্তি হলেও ওদের বাপীরা প্রায় সবাই উৎসাহ দিলেন। সকালে স্নান খাওয়া সেরে খেলমাকে নিয়ে ওরা রওয়ানা দিল, সুবীর, পাপ্পু, দীপু, রন্টু আর অরুণ। প্রায় তিরিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ওরা এসে পৌঁছল খেলমাদের গ্রামে। একটা বড় ব্যাগে কিছু খাবার আর প্রত্যেকের আরেক প্রস্থ কাপড়, অন্য একটা বড় ব্যাগে দা ছুরি আর কোদাল নিয়েছিল ওরা। খেলমার মুখে ওর গ্রামের লোকেরা যখন জানল ওদের অভিপ্রায় তখন প্রায় পঞ্চাশ ষাট জনের মতো আদিবাসী মিকিরলোক দীপদের সাহায্য করেছিল। খেতে দিয়েছিল, রাত্রে ঘুমানোর ব্যবস্থাও ওরাই করে দিয়েছিল। বড় বড় গাছ আর পাথর সরানো মাটি সরানো প্রায় দুই মাইল রাস্তা। পরিষ্কার করতে ওদের তিন দিন লেগেছে। এই তিন দিন ওদের খুব উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। চার দিনের দিন আদিবাসীরা ওদের খুব যত্ন করে মাংস ভাত খাইয়ে তবে ছেড়েছে। সরকারী সাহায্য যখন এসে পৌঁছল তখন দীপরা বুকভরা আনন্দ আর অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছে। আর পেয়েছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একসঙ্গে কাজ করার মতো শক্তি।

ছবি : দিলীপ দাস

মেদিনীপুরের মিরাপারা থেকে হেমেন্দ্রকুমার দে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন গোপালচন্দ্র দের নামে। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা গোপালচন্দ্র দে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

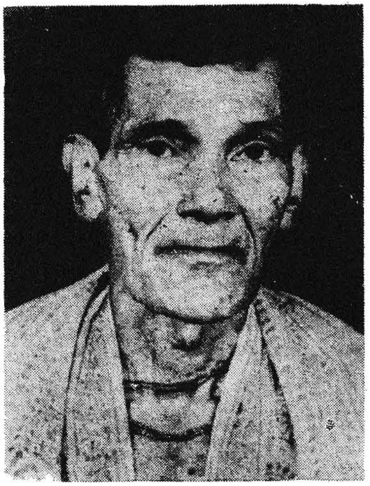

জন্ম : ১১ ফাল্গুন ১৩০৬
মৃত্যু : ৫ পৌষ ১৩৭৯

বিষয়

জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ বৈশাখ

পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা দুটি শুকতারার শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার : ১৫ টাকা : দ্বিতীয় পুরস্কার : ১০ টাকা

ভেবে ভেবে বলো

(এই সংখ্যার সব ক'টি প্রশ্নই মহাকাব্য বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। ভেবে ভেবে বলো। না পারলে বই উল্টো করে ধরে উত্তরগুলো দেখে নাও।)

প্রশ্ন :

১ বাল্মীকি কার কাছে রামচরিত শুনেছিলেন?

২ বাল্মীকিকে রামচরিত লেখার আদেশ দিয়েছিলেন কে?

৩ রাজা দশরথের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?

৪ বনবাসের পথে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ প্রথম রাতটি কোথায় কাটিয়েছিলেন?

৫ রাবণ যখন সীতাকে রথে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সীতার বিলাপ কে শুনতে পেয়েছিলেন?

৬ হনুমান লঙ্কাকাণ্ড করার সময় কার বাড়িতে আগুন লাগাননি?

৭ রাম-লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের মারা নাগবাণের বন্ধন থেকে কে মুক্ত করেছিলেন?

৮ যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াসীতা কে এনেছিলেন?

৯ লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্যে সুষেণ হনুমানকে কি কি আনতে বলেছিলেন?

১০ রাম রাবণকে কোন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছিলেন?

১১ রাবণের পুষ্পক রথটি আসলে কার ছিলো? কার কাছ থেকে রথটি জিতে নিয়েছিলেন রাবণ?

১২ লঙ্কা জয়ের পর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা কিসে করে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন?

১৩ রামায়ণের শুরু অভিশাপ দিয়ে। কে কাকে দিয়েছিলেন?

১৪ রামায়ণপ্রচার করেছিলেন কারা?

উত্তর :

১ নারদমুনির কাছে।

২ ব্রহ্মা।

৩ সুমন্ত্র।

৪ তমসা নদীর তীরে।

৫ জটায়ু।

৬ বিভীষণের বাড়িতে।

৭ পক্ষিরাজ গরুড়।

৮ ইন্দ্রজিৎ।

৯ বিশল্যকরণী, সবর্ণীকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী।

১০ ব্রহ্মাস্ত্র।

১১ কুবেরের। রাবণের দাদা কুবেরকে হারিয়ে রাবণ পুষ্পক রথটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন?

১২ লঙ্কার নতুন রাজা বিভীষণ ওঁদের ফেরার জন্যে কুবেরের পুষ্পক রথটি দিয়েছিলেন। একদিনেই ওঁরা অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন।

১৩ বাল্মীকি নিষাদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ক্রৌঞ্চ পাখি বধ করার জন্য।

১৪ রামের দুই পুত্র লব ও কুশ রামায়ণ প্রচার করেছিলেন। তাঁরা অবশ্য তখন জানতেন না যে তাঁরাই রামের ছেলে।

হাঁদা-ভোঁদার
লোহার টুপি
আমার এই বাক্সগাড়িই সবার থেকে জোর গতিতে ছোটে!
অ্যাই! তুই করছিসটা কি?
তোর গাড়ির গতিতে যতি টেনে দিচ্ছি, ভোঁদা!
রাস্তা সারাই
আঁইক!
রাস্তা সারাইয়ের নিদর্শন দেখলে গাড়ির গতি কমাতে হয় সেটা জানিস না?
তোর যা দরকার সেটা হচ্ছে একটা লোহার টুপি!
ওওওঃ! হতচ্ছাড়াটা ঠিক কথাই বলেছে!
ঐ পুরোনো লোহার টুপি তুমি নিয়ে যাও, ভোঁদা। ও আমার কাজে আসবে না!
পুরানো জিনিসের দোকান
খুব ভালো! আমি ছোটটা ব্যবহার করবো।
এবার আমার সামনে নচ্ছার হাঁদাটার কোন চিহ্নই নেই!
তার কারণ হচ্ছে এবার আমি তোর পিছনে, ভোঁদা!
এটা আবার ওকে থামাবে!
ইরক! আমার পা দড়িতে আটকেছে!

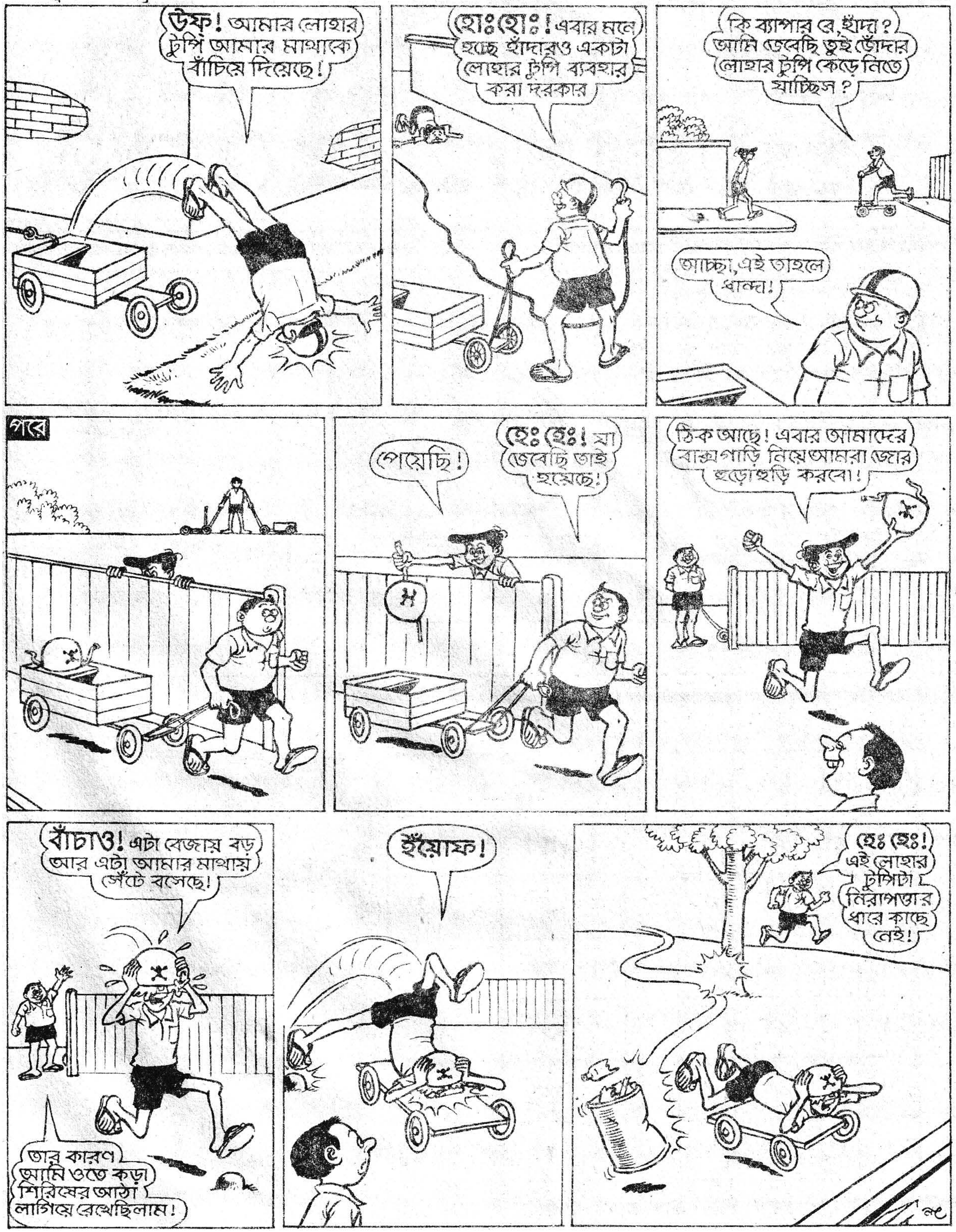
উফ্! আমার লোহার টুপি আমার মাথাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে!
হোঃ হোঃ! এবার মনে হচ্ছে হাঁদারও একটা লোহার টুপি ব্যবহার করা দরকার
কি ব্যাপার রে, হাঁদা? আমি ভেবেছি তুই ভোঁদার লোহার টুপি কেড়ে নিতে যাচ্ছিস?
আচ্ছা, এই তাহলে ধান্দা!
পরে
পেয়েছি!
হেঃ হেঃ! যা ভেবেছি তাই হয়েছে!
ঠিক আছে! এবার আমাদের বাক্সগাড়ি নিয়ে আমরা জোর হুড়োহুড়ি করবো!
বাঁচাও! এটা বেজায় বড় আর এটা আমার মাথায় সেঁটে বসেছে!
তার কারণ আমি ওতে কড়া শিরিষের আঠা লাগিয়ে রেখেছিলাম!
ইঁয়োফ!
হেঃ হেঃ! এই লোহার টুপিটা নিরাপত্তার ধারে কাছে নেই!

নতুন ধাঁধা

১. মাথায় হানিলে আঘাত অস্ত্রের দ্বারা
মুণ্ডহীনে দেখি মোরা রক্তাক্ত চেহারা।
তিন অক্ষরে যোগাযোগ রাখে সবার সঙ্গে
পদবীতেও পাবে তারে অবশ্যই বঙ্গে ॥

নন্দিনী কোনার ও তুহিন কোনার/কয়লানগর, ধানবাদ।

২. এবার দাদা, পেলেন বাধা
নেইকো তাতে সন্দ,
শেষ বিচার-এ জবাব মেলে
এমন মজার ধন্দ।

শঙ্খশুভ্র পাত্র/বালিঘাই, মেদিনীপুর।

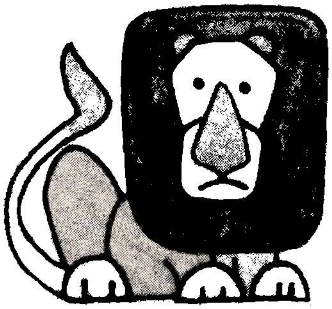

মাঘ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১. পাতলা, ২. পাওনা, ৩. বাগড়া, ৪. নিমেষ

৩. মুঠোয় রাখি যা
সেটাই ধাতু না।

বিভাংশু দত্ত / পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলী।

৪. আগে পরে যন্ত্র তাহার
মধ্যে পাড়ার মাথা
ভাগ্য তোমার ভাগ্য আমার
বলতে পারি তথা।

শ্রাবন্তী দাস/দিসেরগড়, বর্ধমান।

নতুন শব্দমালা

[ক]

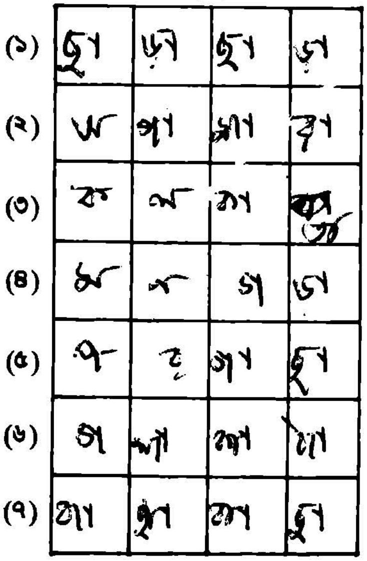

[খ]

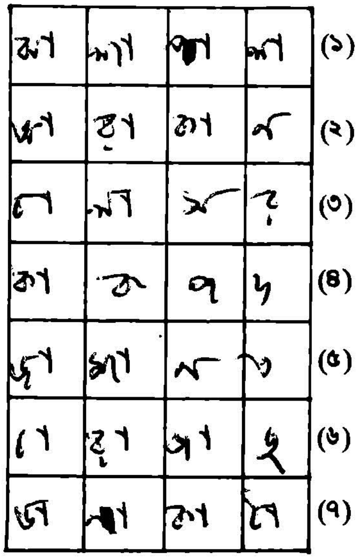

সূত্র (ক)

১. এমনতর হলে সুবাদ
অহরহই ঘটে বিবাদ।
২. মাথা মোটা হাঁদারাম
ভ্যাবাকান্ত বোকারাম।
৩. যন্ত্র সাথে জুড়ে দড়ি
কল্লোলিনী এ নগরী।
৪. কল্পনাতে তৈরি
বাস্তবেতে বৈরি।
৫. গাছের ওপর চড়ে
আপন জীবন ধরে।
৬. দাম খুব বেশি নিলে
দোকানীকে লোকে বলে–
৭. বোঝার মাঝে ক'রে বাছাই
সেরা জিনিস কিনি যা চাই।

সূত্র (খ)

১. জন্ম শতবর্ষ যাঁর
এই বছরে নাটক তাঁর।

তৈরি করেছেন : শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক : সগড়াই, বর্ধমান।

২. দেশটিতে বাস যার
মগ নামে ডাক তার।
৩. গরীবের কুঁড়েখানি
খড় দিয়ে ছাওয়া জানি।
৪. কাকের পায়ের যেমন আকার
বিরাম চিহ্নের (^) তেমন প্রকার।
৫. যদি হয় জব্দ
ভোটকামী স্তব্ধ।
৬. এখন থেকেই যত্ন নিলে
উঠবে ভরে' ফুলে-ফলে।
৭. সুন্দরী আহামরি
পাখাহীনা যেন পরী। [উত্তর আগামী সংখ্যায়]

*** মাঘ সংখ্যার শব্দমালার উত্তর:**

পাশাপাশি

১. মৌমাছি ৩. খাইবার ৭. লরী ৮. স্তনন ৯. বাচক
১১. ভেক ১২. ফিরোজা ১৪. বলদ ১৮. আট ১৯. লাটাই
২১. তিহার ২৩. কড ২৪. নিতবর ২৫. তরাস

ওপর-নিচ

১. মৌলবাদী ২. মারীচ ৪. ইস্তক ৫. বান ৬. রণপা
১০. কফি ১১. ভেজাল ১৩. রোবট ১৫. দলা ১৬. গাইডস
১৭. প্লাতিনি ১৮. আরব ২০. টাকরা ২২. হাত

ভাদ্র সংখ্যার ধাঁধার বাকী উত্তরদাতাদের নাম

।। বর্ধমান ।।

মিঠু, রতন, বাঁটুল, টুম্পা, চিত্তরঞ্জন, আবু, অঞ্জন, তাপস ও অরূপ/এ. বি. এল. কলোনী, দুর্গাপুর; কবিতা, সংহিতা, গোপাল, যাবন, যাদব ও কেশব/এ. বি. এল. কলোনী, দুর্গাপুর; তনুশ্রী, স্নেহাংশু, সন্ধ্যা ও হারাধন ঘোষাল/এ. বি. এল কলোনী, দুর্গাপুর; প্রসেনজিৎ, রিয়া ও মানস/হিন্দুস্থান কেব্‌লস; পাপু, কণা, ভাত, রীতা ও দিলু/পাওয়ার হাউস পাড়া, বর্ধমান; অরুন্ধতী, আরতি/সুভাষপল্লী, বার্ণপুর; ধীরাজ, অসীম ও অশোক আচার্য/বৈকুণ্ঠবাথ, বার্ণপুর; জয়, বুড়ো/বিধাননগর, দুর্গাপুর; ক্ষীরোদ, কনক, বিজন, শুভ্রা, গোপাল, জয় ও রাজু/শ্রীপল্লী, আসানসোল; সঞ্জয়, সমীর, সুদীপ্ত, সুপ্রিয়/ভিড়িঙ্গি, দুর্গাপুর; অশোককুমার, সিদ্ধার্থশংকর, শুদ্ধসত্ত্ব, কাঞ্চনজ্যোতি, সৌম্যশান্ত ও স্বয়ম্ভূরঞ্জন ঘাঁটী/মহিশীলা, কালিপাহাড়ী; রোজি, রিনি, মাধুর/বেনাচিতি, দুর্গাপুর; শ্যামল, সুমিতা, শঙ্খনাথ, বাপী, বাচ্চু ও গৌতম/বস্তী গড়িয়া, রাণীগঞ্জ; মুন্না, বাবলু, মিতু, নিমাই ও স্বপন/আর সাইট, রাস্তা নং-১, চিত্তরঞ্জন; স্বপন, শিবানী, রীতা, সুভাষ, দীপু ও দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/দেবশালা; নিরঞ্জন দাস/ধাণ্ডাবাগ, দুর্গাপুর; প্রতিমা, অণিমা, নীলিমা ও প্রণব/রক্ষিতপুর; টুম্পা, মিঠু ও রুম্পা/খানা জংশন; শম্পা, রাজু, বর্ণা ও অশোক মুখার্জী/বাবুরবাগ; মৈত্রেয়ী, দেবশ্রী, বাবলি ও নমিতা/বর্ধমান শহর; অনিরুদ্ধ ও মিঠুন গোস্বামী/শিবাজী রোড, দুর্গাপুর; মনোজবা বন্দ্যোপাধ্যায়/রাণা প্রতাপ রোড, দুর্গাপুর; অলোককুমার চট্টরাজ/রক্ষিতপুর; স্বপন, প্রবোধ, বাবলু, লালু, বাবু, মুকুল ও অপর্ণা মণ্ডল/নূতন এগেরা, রাণীগঞ্জ; জয়শ্রী, জয়দীপ ও বনশ্রী মণ্ডল/হিন্দুস্থান কেবল্‌স্; পার্থ, পাঁপড়ি, বাবুজি/বিধাননগর, দুর্গাপুর; গার্গী, গায়েত্রী, সরসী, দেবপ্রকাশ, কৌশিক ও অনুপ রায়/এইচ. এফ. সি. কলোনী, দুর্গাপুর; তপন, গোপাই, জয়া, ভারতী ও দুর্গা সিন্‌হা/তেঁতুলতলা বাজার, এম. কে. চ্যাটার্জী লেন; বুলু, বাবলু, পিপলু, বাচ্চু, রানু, শিল্কু, পাম্পু, মনা ও টুম্পা/রেলওয়ে কলোনী, বরাকর; সুমেধা, ঋতপর্ণ, দেবপ্রতি, সুশ্বেতা, শাওনা ও পায়েল/বার্ণপুর; রুগনা, বিপ্লব, রতন, রেবা ও সরস্বতী দে/বাবুরবাগ হাসপাতাল; কৃষ্ণেন্দু, বৈশাখী, মৌসুমী/গোপালমাঠ রেলওয়ে কলোনী, দুর্গাপুর; মৈত্রী ও পুতুল/শিমুলগ্রাম, কুলটি; সোনাই ও বুটুল/কোক ওভেন কলোনী, দুর্গাপুর; গৌতম, উত্তম, আম্পু ও টনি/বনপাস, কামারপাড়া বাজার; স্বপন, মহেন্দর, কৃষ্ণা, অজয়, হৃদয়, দেবাশিস, লালজিৎ, লালটু ও রাণী/শীতলপুর এ. সি. ক্লাব; রাজা, বাদশা, সম্রাট, রূপা, টুম্পা ও বুতাই/শীতলপুর কোলিয়ারী; পিউ, নীলাঞ্জনা, রীতা ও কমলিকা/৪ নং মিধাপুকুর; সুজয়, মলয়, দোয়েল ও পাপিয়া রায়/ইস্কো, কুলটি হাসপাতাল; মিসেস মণ্ডল, ডাঃ এ. বি. মণ্ডল, পিন্টু ও মধু/কুলটি হাসপাতাল; শুভাশিস ও শম্পা রায়/আসানসোল লোকো কলোনী; ছবি, পূরবী, দেবাশিস, দেবব্রত, দীপক ও লীনা/হিন্দুস্থান কেবল্‌স্ হোস্টেল; প্রভঞ্জন, কাঞ্চন, প্রদীপ ও টুম্পা/খণ্ড ঘোষ।

।। বাঁকুড়া ।।

শান্তনু, শর্মিলা, নীলাঞ্জন ও রাজু/লোকপুর; গিরিজা, বাম্পা, বুবাই, সোনাই ও মধুছন্দা/তিলুড়ি; রিন্টু, মুনু, বুচু, রাজু, বুড়ো, পুস্কা ও ছোস্কা/মোলডুবকা; আশিস, কুমারদীপ, নিখিল/শালতোড়া; কুন্তলা, শ্যামাপদ, বিষ্ণু, দীপালি, সোনামণি, সঞ্জীব ও রাজীব সিন্‌হা/পোদ্দারপাড়া; সনৎ, শ্রীকুমার, মহুয়া, বিভা ও বগলা ব্যানার্জী/গুপ্তনাথ; রাধারাণী চট্টোপাধ্যায়/নূতনচটী; উত্তম, গৌতম, তপন, অনুপম ও রূপম/তিলুড়ি; সোমনাথ, সোমেন, পুষ্পেন, মধু, অনুপম ও রাণা/কাদাশোল, বড়জোড়া; বুবু, ইতু, বুলু, বাম্পা, বাপী, বাচ্চু/বড় সোলআনা গলি, বাঁকুড়া।

।। বীরভূম ।।

মৌসুমী, নির্মল, সৃজন ও স্বাতী রায়/রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর; সব্যসাচী, হংসরাজ ও কলাপী চ্যাটার্জী/কীর্ণাহার; সৌমিত্র শংকর চট্টোপাধ্যায়/খরবনা; টোটন, বাপী, জুলি ও পুষি/বড়রা।

।। পুরুলিয়া ।।

নারায়ণ, শাশ্বতী, সম্বিতি ও ভাস্বতী মহান্তি/নডিহা; পুচকু, পাপাই, টুম্পা, মুনমুন ও গোগোল/স্টেশন রোড; সুদীপ্তা, দীপান্বিতা, সুব্রত, বর্ষা/মধুপুর, মানবাজার; দিলীপকুমার চৌধুরী/মধুপুর, মানবাজার; তাপস, মানস, নমিতা ও বিহীকা মণ্ডল/মুনসেফডাঙা, রঘুনাথপুর; ধীরেন, বাদল, বিশ্বম্ভর, শিবশঙ্কর, মাণিক, সমীর, দিলীপ, দীপক ও তাপস/মানবাজার; নির্মল, বাপী, প্রবীর, অমিয়, চিত্ত, রাম, রোহিন ও খোকন/মানবাজার; বুবাই, তোতন, সন্তোষ ও আদিত্যকুমার মুখার্জী/মানবাজার; কল্পনা, বিকাশ, পলাশ, মনোজ, কৃষ্ণা, ময়না, মিঠু, মৌসুমী, মণীষা ও মৌ/লাগদা।

।। মুর্শিদাবাদ ।।

ভূদেব, বুদ্ধদেব, শান্তনু, বুরণ, বিজন, চিনু, মিনু, ব্যারস ও লালু/মধুপুর রোড, বহরমপুর; তানিয়া, বিল্টু, বুবাই, বাপী, লালু ও টিঙ্কু/কে. কে. ব্যানার্জী রোড, বহরমপুর; বাবুন, বুনি ও টিংকু/আহিরণ ব্যারেজ; মোস্তাক হোসেন/রমনা এতবার নগর, ডোমকল; মৌ, জয়ন্ত ও অশোক/রাধাবাজার, কান্দী; বাপি, অর্চিতা, অর্পিতা, অতনু ও লিপি/আজিমগঞ্জ; বাপু, কৃষ্ণা, বুচু, ইতু, খুকু, মুকু ও বাম্পা সাহা/কে. কে. বি. রোড, বহরমপুর; সুমিত চৌধুরী/দক্ষিণ ব্যারাক, বহরমপুর; বৌদি, সোমা, সুভা ও তানি/চার ব্যারাক স্কোয়ার, বহরমপুর; শুভেন্দু, টুম্পা, পুটি, রুম্পা ও বুম্পা/রুটি মহল রোড, বহরমপুর; শাশ্বতী ও কল্যাণী রায়/মহারাজ নন্দকুমার রোড, রাজাগঞ্জ, সৈদাবাদ, খাগড়া।

।। নদীয়া ।।

বিদ্যুৎ, শিল্পী, বিজন, কাবেরী, বিমান ও শিবাণী/রাধানগর, কৃষ্ণনগর; পাপুন, বাবলি ও বাবুন/ডি. এল. রায় রোড, কৃষ্ণনগর; অরবিন্দ দাস/সিদ্ধান্ত পাড়া, রাণাঘাট; অতুল, চন্দ্রা, সুমনা/তমালতলা লেন, নবদ্বীপ; বাবন, সেমু, বাপী, বুধো, ছন্দা ও মানু/মদনপুর, গাঙ্গুলীপাড়া; শিবাশিস, দেবাশিস ও শুভাশিস/বগুলা কলেজ পাড়া, বগুলা; শ্রীদাম, ক্ষিতীশ, বিমান ও সমীর/বগুলা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুলা; সরস্বতী, জয়শ্রী, প্রদীপ, গিরিশ, শ্যামলী, স্বপন ও তপন/আলাইপুর; সনৎকুমার মণ্ডল/আলাইপুর; শ্রাবণী, সুপর্ণা, সোমদীপ, শিপ্রাধনী ও মৌসুমী পাত্র/মুন্সীপাড়া, সুত্রাগড়, শান্তিপুর; ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য/বুদ্ধ পার্ক, কল্যাণী।

কার্তিক সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

।। কলকাতা ও হাওড়া ।।

পার্থপ্রতিম জোয়ারদার/সাহাপুর মেন রোড; বাচ্চু, তপু, মৈনাক ও তৃপ্তি বসু/আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর; দেবল, কমল, সুপ্তি ও শুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়/হাজরা মেন রোড; কল্যাণ, গগন, অমল, মউ, পিউ ও ছন্দা/যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড; প্রতীপ, বিশ্বেষ, অমিতাভ ও অদিতি রায়চৌধুরী/ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, প্রণব মন্ডল /তেঁতুলকুলী; মাস্টার দীপ্তে মানিক গাঙ্গুলী /লিলুয়া; বৈকুণ্ঠ, শিশির, বৈদ্যনাথ, অমর ও শ্যামল নন্দী/শিবপুর; ধ্রুব, সঞ্জয়, বেণু, অরুণাভ ও তাণিমা/বারুইপাড়া, ডোমজুড়;

।। ২৪-পরগনা ।।

বৃন্তা, রাণা ও টুসি/রাধাগোবিন্দ পল্লী, সোনারপুর; দীপংকর, শুভংকর সাহা ও সুধীন্দ্র রায়/সুভাষনগর, সোদপুর; সুপর্ণা ঘোষাল, কাকলি চক্রবর্তী ও প্রসাদ বাচস্পতি/ক্যানিংহাম রোড, নৈহাটী; শান্তনু, বৈশাখী ও রিচি/ শ্যামনগর;

।। হুগলী ।।

জুনি, রিম্মি, টিটু, সোমা ও সমু/রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া; কবিতা, টিঙ্কু, রুবি, রীণা, কল্লু ও শুভ/মাহেশ; প্রদীপ ও মিনতি দে/ব্রেথওয়েট কোয়ার্টার্স, এগ্গাস; শ্যামল ও সজল চ্যাটার্জী/বরিজহাটি; রুপেন্টু, টাটু ও ফুলকাকা/বৈদ্যবাটী; দীপা বসু ও সীমা বসু/রেস গেট, বৈদ্যবাটী; সুপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন, সুপ্রতিম ও সুপ্রভাত রক্ষিত/কোন্নগর;

।। মেদিনীপুর ।।

কৃষ্ণা, সুশীল, নীলিমা, কলি ও বাপি চক্রবর্তী/নীলকুঠি, মিত্র কম্পাউন্ড; জয়া, মায়া, পিয়া ও তপন চট্টোপাধ্যায়/সাউথ ডেভলাপমেন্ট, খড়গপুর;

।। বর্ধমান ।।

খোটন, গোগোল, তুলু, নীলু, বাবুন ও পিকলু/কানাই নাটশাল, ডি. ভি. সি কলোনী; রোজি, রিনি, মাধুর/বেনাচিতি, দুর্গাপুর; কাজল ও চন্দনা কংসবণিক/রাস্তা নং ৮৪, চিত্তরঞ্জন; কমল, শিখা, শুভ্রা ও রঞ্জন/নর্থ রোড, বার্নপুর; অশোককুমার, সিদ্ধার্থশঙ্কর, শুদ্ধসত্ত্ব, কাঞ্চনজ্যোতি, সৌম্যশান্ত, স্বয়ম্ভূরঞ্জন ও অভীকচিত্ত ঘাটী/মহিশীলা, কালিপাহাড়ী; ব্রততী, সুমন্ত, অচিন্ত্য, তপন, গৌতম, সমলু ও পাপলু গাঙ্গুলী/অন্ডাল, বর্ধমান;

।। নদীয়া ।।

বাবু, সোমা ও রিণি/সিদ্ধান্তপাড়া, রাণাঘাট; সদস্যবৃন্দ, রিডার্স ফোরাম/পালপাড়া, চাকদহ; বাবুল, স্বপ্নেশ ও বীথি বন্দ্যোপাধ্যায়/গাঙ্গুলীপাড়া, মদনপুর;

।। বাঁকুড়া ।।

শান্তনু, শর্মিষ্ঠা, নীলু ও রাজু/লোকপুর; শঙ্কর দাস/লোকপুর; গিরিজানন্দ, বয়লাল, তরুময়, বাপ্পা ও বুবাই/গ্রাম+পোঃ তিলুড়ি;

।। পুরুলিয়া ।।

অজয়, সুদর্শন, রাজিব, বংশীধর ও অংগদ মাজি/কুমরডি, আদ্রা; সন্তোষ, নূপুর, চিত্ত, রাম ও মৃত্যুঞ্জয়/মানবাজার; রণ, বিজু ও রবি দে/আদ্রা রেলকলোনী;

।। বিহার ।।

পুচুন, মনু, ইভা ও ছবি/বিষ্টুপুর, জামসেদপুর; সঞ্জু, চুমকি, বিজু, রুমকি, পিংকি, টুম্পা, বুবু, বুতরু ও টিটো/কাটিহার, সিরচাইবাড়ি; ঝুমকা, রূপাই, টুপাই, বাবুলি, রাভা, টুকলা ও বাবু/কাটিহার; দেবী, নীলা, পিঙ্কু, এলা, মৌ ও টুম্বা/কার্মিকভান কলোনী, ধানবাদ।

Statement about the ownership and other particulars concerning Suktara Bengali Children's Monthly

1. *Place of Publication :* 11, Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.
2. *Periodicity of Publication :* Monthly
3. *Printer's Name, Nationality and Address :* Sri B. C. Majumdar, Indian, from New Bengal Press (P) Ltd., 68, College Street, Calcutta-700 073.
4. *Publisher's Name, Nationality and Address :* Sri A. C. Mazumdar, Indian, from Dev Sahitya Kutir (P) Ltd., 11 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.
5. *Editor's Name, Nationality and Address :* Sri Arun Chandra Mazumdar, Indian, 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.
6. *Names and Addresses of individuals who own the newspaper :* Dev Sahitya Kutir (P) Ltd., 21 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.
7. *Partners or Shareholders holding more than one percent of the total capital :*

(a) Sri Arun Chandra Mazumdar, Sri Barun Chandra Mazumdar, Sri Birendra Krishna Ghosh, Sri Aloke Kumar Ghosh, Sm. Arati Basu and Sm Bharati Kar all legal heirs to the estate of Subodh Chandra Mazumdar of 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.

(b) Sri Arun Chandra Mazumdar and Sri Prabir Kumar Mazumdar, executors to the estate of late Nirode Chandra Mazumdar of 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.

(c) Srimati Tapoti Chakraborty, Legatee of the estate of late Madhusudan Mazumdar of 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.

(d) Sri Barun Chandra Mazumdar of 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.

(e) Sri Prabir Kumar Mazumdar of 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.

(f) Sri Prabir Kumar Mazumdar, legal heir to the estate of late Kshirode Chandra Mazumdar of 21/1 Jhamapukur Lane, Calcutta-700 009.

I, A. C. Mazumdar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : March, 1987 Signature of Publisher : A. C. Mazumdar

আফ্রিকার জঙ্গলে

অমিয়কুমার হাটি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা জীপ গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। এ পথটাতে তেমন কেউ আসে না। চালক সহ ৬ জন আছে ঐ গাড়িতে। সারানো এখন যাবে না–কিছু দূর নাকুরু শহর–৪০,০০০ লোকের বাস–সেখান থেকে হয় কারিগর নয় আরেকটা জীপ আনতে হবে। এক সাহেবের আবার আজ বিকালে আমাদের বিজ্ঞান মেলায় বক্তৃতা দেবার কথা।

ঐ সাহেব, ওঁর স্ত্রী, ছেলে মার্টিন ও চালককে উঠিয়ে নিলাম আমরা। আর জায়গা নেই। বাকি তিনজন রইল। চালক আরেকটা গাড়ি নিয়ে ফিরবে।

মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে চলল সাহেব আর সাহেবের বৌ। খাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি ফ্লেমিংগোও।

ঝকঝকে নতুন সাফারি জীপ। নাইরোবি শহর ছেড়ে যায় যায়, এমন সময় ওয়ারসর সাহেব ড্রিল চেঁচিয়ে উঠল, জাপানী বিজ্ঞানী আসাই কোথায়? ওঁকে তো দেখছি না!

তাইতো! ওঁরও তো যাবার কথা। আবার ঘুরল গাড়ি–দাঁড়াল হোটেলের সামনে–নামটা বড় অদ্ভুত হোটেলটার–সিকস এইটটি। মানে–'৬৮০'। হাসিখুশি আসাইকে টেনেই তুললেন সবাই। সবাই ভুলোমনা বিজ্ঞানী। ড্রিল মনে না করিয়ে দিলে আসাই পড়েই থাকতেন, আসাই হতো না তাঁর মোম্বাসা। সবাই না হেসে পারল না, ড্রিল যখন বললেন,–মাথা গুনতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো, একজন যেন কম!

সাফারি জীপটি নাইরোবি ছাড়িয়ে কালো চকচকে চওড়া মসৃণ পিচঢালা পথ বেয়ে তীরের বেগে সোজা ছুটে চলেছে কেনিয়ার সাগর উপকূলের খুবই পুরানো অথচ সাজানো-গোছানো ছবির মতো অপরূপ বন্দর শহর মোম্বাসার দিকে। গাড়িটা যেন একটা মিনি পৃথিবী–গোনাগুনতি মাথা–ওয়ারসর ড্রিল, আমেরিকার লী এবং হ্যালক দম্পতি, জার্মানীর রুডলফ, জাপানের আসাই, নাইরোবির ওটিয়েনো এবং ভারতের মৃণাল ও আমি। যাওয়াটা সাগরবেলায় ঝিনুক কুড়ানোর ছলে নয়। সাগর থেকেই এসেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রাণী অ্যামিবা। এককোষী প্রাণী। প্রোটোজোয়া বর্গের। এবং আফ্রিকা–তার বয়সেরই বা গাছ পাথর কোথায়! বোম্বাই-এর উল্টোদিকে ভারত মহাসাগরের কোলে আদিম আফ্রিকার কোরাল (প্রবাল) ঘেরা সাগরতটে আদি প্রাণীর কিছু খোঁজখবর পেতে চান ওঁরা।

সারাদিন চলমান বাসে বসে আফ্রিকার বিশাল প্রকৃতি পাঠ করা এক বিরল সুযোগ। কখনো চোখে পড়ছে জিরাফ, আপন-মনে চলেছে হেলতে দুলতে, কখনো বা বেবুনের পাল। কখনো পড়ছে একদম ফাঁকা ময়দান–মাইলের পর মাইল। তার উপর দিয়ে চলেছে মোম্বাসা যাবার রেল লাইন। ছাড়ে নাইরোবিতে বিকালে, পৌঁছায় মোম্বাসায় পরদিন সকালে। কখনো পড়ছে পাহাড়–ছোট অথবা বড়, একদিকে, কখনো বা পথের দুদিকেই। 'কামবু' বলে একটা জায়গা পেরিয়ে গেল ১২টার সময়। যদিও গরম নেই, তবু সোয়েটার পরার মতো শীতও নয়। লী খুলে ফেলল সোয়েটার–গেঞ্জির উপরে পরেছিল।

এসে গেল কেনিয়ার আর একটি বিখ্যাত সংরক্ষিত জাতীয়

বনাঞ্চল—সাভো। ঢুকতেই 'সাভোইন', ছিমছাম হোটেল। খুব ভালো রুচিকর খাবার।

সাভোতেও দেখা যায় হাতি ও মোষের পাল, কিছু রাইনো, সিংহ, অ্যান্টিলোপ, গ্যাজেল, জিরাফ, জেব্রা। তবে সব থেকে মন কাড়ে এখানকার 'কুমীরের শিবির'—সাবাক নদীর তীরে। নাম ধরে ডাকা যায় কুমীরকে।

হঠাৎ কানে এলো তীক্ষ্ন কোঁ কোঁ শব্দ একটা জায়গায়। জলের কাছে? বালির ধারে? ডিম ফুটে বেরিয়েছে কুমীর ছানারা। ওদেরই করুণ চীৎকার।

কুমীর জলে যদিও থাকে, ডিম পাড়ে ডাঙায়, বালির উপরে। তারপর বালি খুঁড়ে লুকিয়ে রাখে ডিমগুলো। রোদ পড়ে তার উপর। সেই গরমে ডিম ফোটে। মা কুমীর থাকে ডিমগুলোর কাছাকাছি, পাহারা দেয়, বিশেষ করে বড় এক ধরনের গিরগিটি খুব ভালবাসে কুমীরের ডিম খেতে, তাদের কবল থেকে ডিম বাঁচাতে। ডিম ফুটে ছানা যখন বেরোয়, তখনো থাকে বালির ভিতর, তাই বাইরে আসবে বলে ঐ চিঁ চিঁ আওয়াজ। মা এখন বালি খুঁড়ে বের করবে ছানাপোনাদের, কয়েকদিন রাখবে নিজের কাছে, কারণ অবোধ শিশুদের বড় করতে হবে তো! ছানাপোনারা খায় পোকামাকড় বা ছোট মাছ। বড় বড় কুমীর—তারা অনেক বড় জীব ধরতে পারে।

ঐ যে জলে ডুবে আছে ঘাপটি মেরে, ভাসছে, দেখা যায় শুধু চোখ দুটো ও নাকের ফুটো—কোন জীব। যেমন কোনো অ্যান্টিলোপকে জলের ধারে জল খেতে আসতে দেখলেই চুপিসাড়ে কাছে গিয়ে ওর পায়ে দেবে লেজের সপাট ঝাপট, ফেলবে শিকারকে জলে, ডুবিয়ে মারবে, তারপর টেনে নিয়ে যাবে নিজের আস্তানায়। ঝামেলাটা এই যে, কুমীর খুব ভাল চিবোতে পারে না। তাই সাধারণতঃ সে শিকারটাকে একটা গর্তে লুকিয়ে রাখে, সেটা পচলে তখন খেতে তার সুবিধা হয় কিছুটা। তারপরেও তার দাঁতে বুঝি মাংস বা হাড়ের টুকরো লেগে থাকে। রোদ পোহাচ্ছে একটা কুমীর বালির উপর শুয়ে, বিষম সাহসী দুটো পাখি ঠুকরে তার দাঁত থেকে বের করছে খাবারের টুকরো—দাঁত সাফ ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ঐ চুনোপুঁটি পাখি দুটিকে দেখেও দেখছে না কুমীরটা।

১০০ বছর আগেও আফ্রিকাতে ৭ মিটারেরও বড় কুমীর দেখা যেত। মানুষ মেরে মেরে বড় জাতের কুমীর শেষ করে এনেছে। কারণ কুমীর মারতে পারলে তার চামড়া বিকোবে অনেক দামে। এখন ৫ মিটারের থেকে বড় কুমীর বড় একটা দেখা যায় না।

সাভো অভয়ারণ্য থেকে জীপে মোম্বাসা যেতে ঘণ্টা চারেক লাগে। মোম্বাসা আসতে তখনো ঘণ্টাখানেক বাকি। ভূ-প্রকৃতির চেহারাই যে বদলে গেল একেবারে! এ যেন দক্ষিণ ভারতের কোনো জায়গা, কোচিন বা ত্রিবান্দ্রাম বা মদ্রাজের কাছাকাছি। এর আগে আফ্রিকার গাছপালা বন-জঙ্গল কম দেখিনি। কেমন যেন তুলনামূলকভাবে রুক্ষ, অনুর্বর মনে

মোম্বাসায় ঢুকতে হবে দুটি বিশালাকার দুধসাদা কৃত্রিম হাতির দাঁতের তোরণ দিয়ে

হতো, কিন্তু এখন দুধারে নয়নমনোহর শ্যামলিমা, নারিকেল বীথি, আমবাগান, ধানক্ষেত। বাতাসে ভাসে কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।

সাদা বালুতট বলেই হয়ত হোটেলটার নাম "হোয়াইট স্যানড্"। সাগরের একেবারে গায়ে লাগা হোটেল। নারিকেল গাছ সারে সারে। আরও কত পাম গাছ! আকাশ নীল, সেই রং মেখে সাগরের জলও গাঢ় নীল। দূরে দেখা যায় সাদা সাদা প্রবাল প্রাচীর বা প্রবাল পাহাড়। যেন ঘিরে রেখেছে মোম্বাসাকে। বিশেষ ধরনের খেলনা নৌকায় পাল তুলে দিয়ে ভাসছে কেউ কেউ একা একা তীরের কাছে বা দূরে। ওদের বুঝি ভয় করে না এতটুকু। তীরভূমির এলাকাও বিশাল—পাশে পাশে বহু হোটেল। বালি সাদা, তাই কাঁকড়াগুলোও সাদা— ওদের লুকোবার সুবিধা এতে। নানা রকমের শৈবালদল ছোট বড় পড়ে আছে। পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে মট মট শব্দ হয়। ড্রিলও দেখছি আমার মতো ঐ শৈবালদল মাড়িয়ে মট মট শব্দ করতে করতে এগোচ্ছে। আছে নানা ধরনের প্রাণী—সমুদ্রশসা, সাগর-সজারু (Sea Urchin) প্রভৃতি। সাগর-সজারু নাম—তার মানে সজারুর মতো বড় নয়, স্বস্তিক চিহ্ন বা তারকার মতো, সারা গা কাঁটায় ভরা। সাগর এখানে তত গভীর নয়— নেমে হেঁটে অনেকদূর যাওয়া যায়। যাচ্ছেও ওরা, শৈবালদল থেকে, এমনকি সমুদ্রশসা থেকে আদি প্রাণী খুঁজতে। নেমেছি আমিও, শুধু পায়ে ফুটছে সাগর-সজারুর কাঁটা—লাগে বেশ, রক্তও বের হয়। তবে, সাগরের লোনা জল—তাই সেপটিক হতে পারে না।

মোম্বাসা শহরের বেশির ভাগ জায়গাই ঝকঝকে, তকতকে। ৫ লক্ষ লোকের বাস, কেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। আশেপাশে ঝোপঝাড় জঙ্গল আছেই, যা আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য। শহরটায় ঢুকতে হবে দুটি বিশালাকার দুধসাদা কৃত্রিম হাতির দাঁতের তোরণ দিয়ে। অধিবাসীদের বেশির ভাগ ওমানি আরব ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ধর্মেরও সহাবস্থান— হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ (৪৯টা মসজিদ আছে) ও খ্রীষ্টানদের গীর্জা—পাশাপাশি। মিশকালো কারুর রং, আবার আফ্রিকার এই শহরেই দেখা মিলবে দুধে-আলতায় মেলানো গায়ের আভা—অপরূপ রূপবতী আরব জাতি—সম্ভূত- মেয়েদের।

মোম্বাসা শহরের কাছে একটা বনাঞ্চলে দেখা যাবে এদেশের সব থেকে বড় গাছ বাওবাব। হিসাব করতে গেলে, ১৫০-২০০ বছর আয়ু এক একটার। কঠিন ফলের মতো ঝুলছে গাছ থেকে, লোনা বীজ। বেবুন ভেঙে খেতে পারে, খায়ও। গরিব মানুষরাও খায়, শক্ত খোসাটা ছাড়িয়ে।

পথের দুধারে নানা গাছ পুঁতেই সাজানো যায়। এখানে কোনো কোনো রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে লাগানো হয়েছে দু ধরনের গাছ, খুবই পরিচিত, ফুলসহ কল্কে ও কাঠচাঁপা। বড় ভাল লাগছিল ঐ সমাজ। সাদা বা বেগুনে আভা কাঠচাঁপা ও

আকাশে ডানা মেলার অপেক্ষায় পেলিক্যান

হলুদ কল্কে ফুল পথের ধূলায়ও গড়াগড়ি খাচ্ছে। থরে-বিথরে এখানে ওখানে লাল সন্ধ্যামণি ফুলের ঝোপঝাড়। পেঁপে গাছ, কলা গাছ, আনারস ক্ষেত আবার কোথাও গোলাপ বাগিচা। হোটেল, বাড়ি, বাগানের গেট বোগনভেলিয়ায় ছয়লাপ। আফ্রিকার কালো মানুষগুলো রঙিন ফুল বোধহয় বড় বেশি ভালবাসে!

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা প্রথম মোম্বাসাতে এসেছিলেন আজ থেকে ৫০০ বছরেরও বেশি আগে। এখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি—কালো চামড়ার লোকেদের মনে তখনি পড়েছিল অশুভ ছায়া। মোম্বাসা ওঁদের ছেড়ে যেতে হয় ৭ দিনের ভিতরেই। এর প্রায় ১০০ বছর পর এলো তুর্কীরা। তারপর ওমানি আরবের দল। তারও পরে ইংরাজ। চলল জমি দখলের লড়াই।

সেই লড়াই চালাতে সবার আগে দখলদার পর্তুগীজরা আজ থেকে ৪০০ বছর আগে একটা দুর্গ তৈরি করে সাগরের ধারেই। যদিও দুর্গ, তাহলেও অহিংসার অবতারের নামে নাম দেওয়া হয় 'ফোর্ট জেসাস'। এ দুর্গ না দেখলে পুরানো মোম্বাসাকে ঠিকমতো দেখাই হবে না। জানা যাবে না শেষ অবধি বিদেশী ইংরাজ কী ভাবে দখল করেছিল, খুন, জখম, লুঠ, রাহাজানি, বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে। একই কান্নাভেজা ইতিহাস! লালকেল্লার মতো অতীত তাই বুঝি গুমরে মরে এখানেও!

এখানে আরেকটি পরিচিত গাছ দেখা যাবে, নিম, দুর্গের ভিতরে ও বাইরে।

দেখলাম একটা হোটেলের নাম ট্যামারিন্ড—তেঁতুল। আমরা অতটা খেয়াল করিনি। কিন্তু রুডলফ ছাড়বে না—ও চারধার খুঁজতে শুরু করল, কোথায় আছে তেঁতুল গাছ। নাম যখন দিয়েছে, থাকতেই হবে। এই মানুষটি বড় অদ্ভুত, ছটফটে, কাজ করছে ঐ আদি প্রাণী নিয়ে ৮ বছর ধরে। সব কিছু নিয়ে তাঁর সমান কৌতূহল—জানার বাসনা। পড়েছেন

প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পক্ষীবিদ্যা, নৃবিদ্যাও! ছাত্র হিসাবেও ছিলেন খুব ভাল। প্রকৃতি পাঠও বুঝি তাঁর আরেকটি বিষয়। বছর পনেরো আগে একবার এসেছিলেন কেনিয়া, সেবার ভিড়েছিলেন পর্বতারোহীদের দলে–উঠেছিলেন কিলিমাঞ্জারোর চূড়ায়–দেখলেন পুরানো ডায়েরি খুলে, যা রেখে দিয়েছেন এতদিনও না হারিয়ে!

কোথায়? কোথায় তেঁতুল গাছ? খুঁজে আর পায় না সাহেব। না খুঁজেও ছাড়বেন না। এদিকে যে যার পছন্দমতো খাবারের মেনু বলে দিয়েছি। ওদিকে সাহেব খুঁজছেন। শেষ অবধি শুধালেন হোটেলের এক বয়কে। সে তখন হাসতে হাসতে রুডলফকে নিয়ে গিয়ে নিচের দিকে সাগরের ধারে দেখালো একটা মাঝারি গোছের তেঁতুল গাছ!

কিছুটা স্বস্তি পেয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে আবার অস্বস্তিতে পড়লেন। আমরা সাগরের জলে, তীরভূমিতে কাজ করছি। কারুর পায়ের ট্রাউজার গোটানো, কেউ-বা সর্টস পরে। মশা বসছে সাহেবের পায়ে। তাই জীপে গিয়ে আবার মোজা জুতোসহ পুরো সাজ পরে এলেন রুডলফ।

মোম্বাসার একটা নামী হোটেল এটি। নানা খাবার পাওয়া যায়। যে যার খুশি মতো মেনু বলেছে। লী, রুডলফ, ড্রিল ও ওটিয়েনো নিলেন তেলাপিয়া। দাম ৮০ টাকা। সে নাকি উপাদেয়! আমি নিলাম প্রণ অ্যাভোগাডো।

ফলটার ভিতরে একটা শুধু ছোট চিংড়ী মাছ। দাম ৩০ টাকা। মৃণাল বলেছিল লোবস্টার–বড় চিংড়ী–না দেখলে বোঝাই যাবে না–ইয়া বড়–দেড় ফুটের মতো–সত্যিই ওই-ই আসল সামুদ্রিক জিনিস খাচ্ছে। ওয়েটারটা ওর গলায় বিশেষ রুমাল বেঁধে দিয়ে গেল। সাহেবদের চোখও ছানাবড়া। রান্নাও তেমন জুতসই। তারিয়ে তারিয়ে খেল মৃণাল।

বিল যখন এলো, চোখ কপালে উঠল মৃণালের–আড়াইশো টাকা! ওর পকেট আমার পকেট উজাড় করেও পুরো বেরুল না, কে আর বেশি টাকা নিয়ে কাজে বেরোয়! রুডলফের কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার করতে হলো।

আফ্রিকার মাঠে ঘাটে, হ্রদে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, গাঁয়ে, শহরে, সাগরতীরে থাকার দিনগুলো শেষ হয়ে এলো। ফিরে যেতে হবে। নাইরোবি কি বাধা দিতে চায়? না হলে পথ পেরুতে গিয়ে হঠাৎ ওরকম আছাড় খেলাম কি করে শুকনো রাজপথে? সব আগে যে ছুটে এলো, তুললো আমাকে ধরে, ঝেড়ে দিল কোটের ধূলা, সে এক শিখ যুবক।

–"লাগেনি তো?" মমতাভরা চকচকে চোখে শুধালো শিখ যুবক।

–"না-না, অসংখ্য ধন্যবাদ।" তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরি। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের দুটি সাধারণ মানুষ আমরা এই মুহূর্তে অসাধারণ আবেগে মথিত হচ্ছি।

শেষ

কাজীর কীর্তি

শেখর আহ্‌মেদ

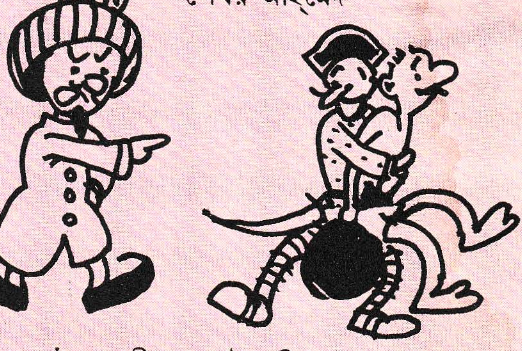

বাদশা খাঁয়ের ভীম দাপটে হাকিমপুরের বুকে
নেইকো চুরি, নেই ডাকাতি–সবাই আছে সুখে।
রটলো গুজব: নেইকো যখন চুরির বিপদ কোনও
নেই প্রয়োজন মাইনে করা কাজীর প্রয়োজনও।
শুনেই কাজীর চক্ষে হঠাৎ সর্ষে ফুলের শোভা
নেইকো আহার–নেই চোখে ঘুম–একেবারে বোবা।
হঠাৎ সেদিন রাত দুপুরে রসুইখানার ধারে
বামাল সমেত পড়ল ধরা ভীষ্মলোচন পাঁড়ে।
কাজীর ঘরেই সিঁদ দিয়ে সে ঘর করেছে খালি
পেছন থেকে পাকড়েছে তায়, চাকর নফর আলি।
বসল বিচার, বলেন কাজী, "এয়্ বেশরম চোর,
চড়বি শূলে, লেকিন, কিছু বলার আছে তোর?"
যুক্ত করে ভীষ্ম বলে একটুখানি হেসে
"মরব হুজুর, আজ তোমারেই রক্ষা করতে এসে?"
কট্‌মটিয়ে তাকান হুজুর লাল চোখে তার পানে,
মরার আগেও **ভীষ্ম** ব্যাটার ডর্ নেইকো জানে!
ভীষ্ম বলে, "চোর অভাবে হুজুর বসেন পথে
তাইতো ধরা দিলাম, চুরি করেই কোনমতে।"
লাফিয়ে উঠে বলেন কাজী দাড়ির ডগা নেড়ে,
"এই কে আছিস, পান্ডেজীকে এক্ষুনি দে ছেড়ে।
একটু হলেই শহীদ হত পরেজ্‌গারের জান্
কোপ্তা পোলাও খাইয়ে দিবি সাতশ মোহর দান।"

ছবি: রাহুল মজুমদার

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেলো! কী, চমকে উঠলে নাকি? মনে নেই বুঝি, ফাল্গুন মাস থেকেই শুকতারা, বছর শুরু। এই মাসের শুকতারা উল্টে পাল্টে দেখলেই বুঝতে পারবে—এখন থেকে শুকতারা আরও ভালো আরও সুন্দর আরও মজাদার হয়ে উঠেছে। এখন দেখবে শুকতারার প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যার মতো জমজমাট। তোমাদের কেমন লাগলো আর নতুন কি কি চাও—সব জানিও কিন্তু।

তাহ'লে এবারের মতো শীত শেষ। তবে যাই বলো, শীতের মজাই আলাদা। বেড়াতে মজা, খেলতে মজা, খেতেও মজা। সব মিলিয়ে শীতের মাসগুলি দারুণ। আর এই শীতের শেষে আম গাছে বোল ধরেছে। একটা দুটো করে গুটি দেখা যাচ্ছে। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ চারদিকে। মৌমাছিরা দারুণ ব্যস্ত। মধু বয়ে আনছে। বর্ষার জন্যে মধু সঞ্চয় করছে।

সে তো হলো। এদিকে আমাদের এক বন্ধু জানতে চেয়েছে, দুহাজার সাল হলে কি লিখবে। এখন যেমন ১-৩-৮৭ লিখছে তখন কি লিখবে? আমাদের মনে হয় নতুন শতাব্দীতে সম্মান জানাতে প্রথম বছরটা অন্তত পুরোটা অর্থাৎ ২000 লেখাই ভালো। পরে না হয় '00 লেখা যাবে। থাকগে ওসব কথা। এসো এবার একটা গল্প শোনা যাক। আচ্ছা, আগে বলো দেখি—তোমরা বেড়াল তপস্বী কথাটা শুনেছো কিনা। নিশ্চয়ই শুনেছো তাই না? যারা ভালো মানুষ সেজে থাকে আর তলায় তলায় দুষ্টুমী করে তাদেরই তো বেড়াল তপস্বী বলে। তা কথাটা এলো কোথা থেকে? সেই গল্পটাই বলি।

অনেক, অনেকদিন আগের কথা। তখন সত্য যুগ। সুঘোষ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত। তাঁর স্ত্রীর নাম সুশীলা। তাঁদের কোনো ছেলেপুলে ছিলো না। দু'জনের বয়েসও হয়েছে। তাঁরা ঠিক করলেন, আর সংসারে থাকবেন না। বনে গিয়ে থাকবেন। বাকি জীবনটা তপস্যা করেই কাটিয়ে দেবেন।

দুজনে একদিন জঙ্গলে গেলেন। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় একটা বেড়ালছানা দেখতে পেলেন। ছোট্ট ছানা। বসে বসে কাঁদছে। তার চারপাশে কাক আর অন্য সব পাখি। বিরক্ত করছে তাকে। ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই এখানে একা একা কি করছিস?

বেড়ালছানা বললো, আমার কেউ নেই, আমি অনাথ। একা এখানে পড়ে আছি।

ব্রাহ্মণ বেড়ালছানাটাকে তুলে নিলেন। দিলেন ব্রাহ্মণীকে। দুজনেই খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বেড়ালছানার খাওয়া-দাওয়ার অভাব নেই। দিব্যি আরামে আছে। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়! সে পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে চুরি শুরু করে দিলো। কেউ তাকে ধরতে পারে না। মারতে গেলে পালিয়ে আসে ব্রাহ্মণের কাছে।

প্রথম প্রথম সকলে ব্রাহ্মণের কাছে এসে নালিশ করতো। কিন্তু যখন দেখলো তাতে কিছুই হচ্ছে না তখন তারা গালাগাল দিতে শুরু করলো। ভীষণ রেগে গেলেন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। তাঁরা ভাবলেন, বেড়ালটাকে তাঁরা নিজেদের ছেলের মতো বড় করলেন আর আজ তার জন্যেই তাঁদের এই হেনস্থা। রাগের চোটে তাঁরা বেড়ালটাকে দু তিনদিন দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখলেন।

এদিকে বেড়ালের মনে বৈরাগ্য দেখা দিলো। সে ঠিক করলো, একবার ছাড়া পাই, আর এখানে থাকবো না। বনে যাবো। তপস্যা করবো। অনাহারে প্রাণত্যাগ করবো। সত্যি সত্যিই তাই করলো সে। দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে সে ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে পালিয়ে দন্ডক কাননে চলে গেলো। বিন্দু সরোবরে স্নান করে সে ঘুরতে লাগলো তীর্থে তীর্থে। সকলে তাকে বেড়াল তপস্বী বলেই মেনে নিলো। কারো কোনো ক্ষতি করতো না। খেতো না। শুধু ভগবানের নাম করতো সে। এইভাবে সারা পৃথিবী ঘুরছে সে।

ঘুরতে ঘুরতে সে এলো সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপে। সেখানে অনেক ইঁদুরের বাস। বেড়াল তপস্বী সেই দ্বীপে গিয়ে উঠলো। তাকে দেখে ইঁদুররা তো সব ভয়ে কাঁটা। এবার বুঝি তাদের খেয়ে ফেলবে ঐ বিড়াল। কিন্তু বিড়াল তপস্বী সব ইঁদুরকে ডেকে বললো, আমি তপস্যা করছি। তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি কারও কোনো ক্ষতি করবো না। আমি বাতাস আর সমুদ্রের জলই শুধু খাই। তোমরা নির্ভয়ে থাকো। আমাকে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো।

তবু ইঁদুরদের ভয় যায় না। তারা দূরে দূরে থাকে আর লক্ষ্য রাখে। কিন্তু তারা দেখলো—সতিাই বেড়ালটা অন্য বেড়ালের মতো নয়। দিন রাত শুধু তপস্যাই করে। তাদের কোনো অনিষ্ট করছে না। এইভাবে দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে বেড়ালের ওপর ওদের আস্থা আসে। না এ বেড়াল তাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

খাবারের সন্ধানে ইঁদুরদের অনেক দূরে দূরে যেতে হতো। শুধু বাচ্চারাই বাড়িতে থাকতো। ইঁদুররা আবার নির্ভয়ে খাবারের সন্ধানে যেতে লাগলো। এদিকে কচি কচি ইঁদুরছানা দেখে আর বেড়ালের জিভে জল আসে। কতোদিন আর এইভাবে থাকা যায়। সে করলো কি—ইঁদুররা চলে গেলেই একটা করে বাচ্চা ধরে চুপি চুপি খেতে লাগলো। কেউ দেখতে

পেলো না তার কান্ড। ইঁদুরছানা খেতে খেতে তার শরীরটাও বেশ নধর হয়ে উঠলো। ওদিকে সে তপস্বীর ভেক ধরে থাকলো। ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে রোজ সে ইঁদুরছানা খাচ্ছে।

কিন্তু সন্দেহ দেখা দিলো ইঁদুরদের মনে! প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ছানা কম। কোথায় যাচ্ছে তারা? তাহ'লে কী ঐ বেড়ালটা খাচ্ছে। ও তাহ'লে ভন্ড। তপস্বী না ছাই। ইঁদুররা চুপি চুপি সভা ডাকলো। ঠিক করলো, জব্দ করতে হবে ভন্ড বেড়াল তপস্বীকে। বাঁচাতে হবে তাদের ছানাদের। কারণ বাড়িতে থেকে তাদের পক্ষে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। সবাই মিলে ঠিক করলো মস্ত গর্ত করে তার মধ্যে ভন্ড বেড়াল তপস্বীকে ফেলে দেবে। একজন বললো, তা না করে ওর গলায় একটা ঘন্টা বেঁধে দাও। ঘন্টার শব্দে বাচ্চারা বুঝতে পারবে ও আসছে। অমনি পালিয়ে যাবে। কিন্তু ঘন্টাটা বাঁধবে কে? তেমন কাউকে পাওয়া গেলো না। তাই ঠিক হলো, ও সব ঘন্টা টন্টা নয়—ওকে গর্তে ফেলে মারতে হবে।

ইঁদুররা সকলে মিলে বেড়ালটা যেখানে থাকে তার তলায় গভীর গর্ত খুঁড়তে লাগলো। ইঁদুরদের মতো ভালো গর্ত খুঁড়তে আর তো কেউ পারে না। কয়েকদিনের মধ্যেই গর্ত হয়ে গেলো বেড়াল তো কিছু জানে না। সে সত্যি সত্যি একদিন ঐ গর্তে পড়ে প্রাণ হারালো। ইঁদুররা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তাদের ছানা বাঁচলো ভন্ড বেড়াল তপস্বীর হাত থেকে।

কেমন লাগলো গল্পটা? আজ তাহ'লে এই পর্যন্তই। ভালো থাকো সকলে। আদর আর ভালোবাসা নাও। জয় হিন্দ!

তোমাদের
দাদুমণি

তোমাদের পাতা

হাল্কা হাসি

কাবলু– হাবলু, তুমি কি তোমার নতুন পেনটা আমার কাছে বিক্রি করবে?

হাবলু (একটু ভেবে)– এটা আমি ৮ টাকা দিয়ে কিনেছি। ঠিক আছে, এক সপ্তাহ যখন হয়ে গেল, তখন ৬ টাকা দিলেই হবে।

কাবলু– তাহলে আমি এটা তিন সপ্তাহ পরে নেব।

বন্যাঙ্ক দত্ত, বয়স ষোল, রেক্স হাউস, চকবাজার, হুগলী।

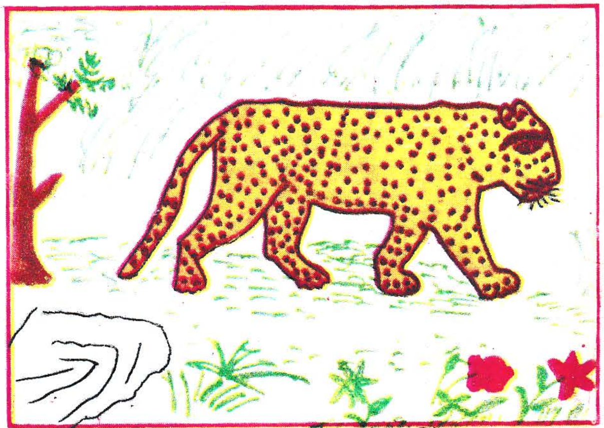

সুব্রতকুমার চক্রবর্তী
বয়স চোদ্দ, দশম শ্রেণী, রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান।

অপর্ণা সেন, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠ, সল্ট লেক।

আমি বুবুন

আমার নাম বুবুন। আমার বয়স পাঁচ। আমার বাবা আমাকে কেরালা দেখিয়ে এনেছেন। আমি সেখানে সমুদ্র দেখেছি। কেরালার সমুদ্র খুব বড়। অনেক নারকেল গাছে ঘেরা। কেরালা অনেক দূর। রেলগাড়ি চড়ে যেতে হয়। কেরালার সমুদ্রের ধারে আমি নুড়ি কুড়োতাম। নুড়ির পর নুড়ি সাজিয়ে রেলগাড়ি বানাতাম। কেরালা অনেক দূর। তাই ভাল লাগে না। এখন আমি কেরালাতে নেই। এখন নন্দপুরে। বাবা আমায় শ্লেটে এ বি শেখান মা শুধু বকে। ঠাকুমা আদর করেন। আমি লজেন্স খেতে খুব ভালবাসি।

বুবুন কুমার খাঁড়া, বয়স পাঁচ, প্রথম শ্রেণী
নন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেদিনীপুর।

Response 1011

মাসের নাম মার্চ

আরতি বসু

এবার আর ভুল হয়নি। মাস পড়তেই গল্পের ঝুলি খুলে বসেছি টুনুর কাছে–

পালিয়ে যাচ্ছেন রাজকুমার ঈনিয়াস । সংগী মাত্র কয়েকজন ট্রোজান যোদ্ধা। তাঁরা সকলেই কিন্তু আপ্রাণ লড়েছিলেন। দেশের সম্মান আর রাজা প্রায়ামের মানরাখার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। তবু শেষরক্ষা হলো না। জাহাজ গভীর সমুদ্রে পৌছুবার আগে আর একবার পিছন ফিরে তাকালেন ঈনিয়াস–দাউ দাউ করে জ্বলছে ট্রয় নগরী। ভেসে আসছে গ্রীক সৈন্যদের উল্লাস। ঈনিয়াস এবং তাঁর সংগীসাথীদের মুখ প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে উঠল। এ অপমানের শোধ তাঁরা নেবেন, প্রমাণ করবেন পৃথিবীতে তাঁরাই বীরশ্রেষ্ঠ।

বেশ কয়েকদিন হলো ভূমধ্যসাগর বেয়ে ভেসে চলেছেন তাঁরা। জাহাজ ভেড়াবার মতো কোনো জায়গা এখনও পাননি। এমন সময় হঠাৎ এক রাতে চারদিক তোলপাড় করে ঝড় উঠল। সেই প্রচন্ড ঝড়ের ঝাপটায় দিক হারিয়ে তাঁদের জাহাজ গিয়ে আটকাল একটি নদীর মোহনায়। দিনের আলো ফুটতে দেখা গেল তাঁরা পৌছেছেন টাইবার নদীর তীরে ল্যাভিনিয়াম শহরে।

রোমানদের বিশ্বাস এই ঈনিয়াস এবং তাঁর সংগীসাথীরাই তাঁদের পূর্বপুরুষ। এঁরাই পরে ল্যাটিন, এট্রুস্কান, স্যামনাইট, উমব্রিয়াম প্রভৃতি ইতালির বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর কেটে গেছে প্রায় পাঁচশ বছর। খৃঃ পূঃ ৭০০ শতকে ল্যাটিনদের রাজা রেমাস ভেবে দেখলেন নদীর মোহনায় রাজধানী রাখা ঠিক নয়। বারবার গ্রীক আর ফোনেশিয়রা আক্রমণ করছে। তিনি তাই রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন নদীমুখ থেকে মাইল কুড়ি ভিতরে। টাইবার নদীর তীরে একটি পাহাড়ী এলাকা বেছে নিয়ে গড়ে তুললেন নতুন রাজধানী, রোম।

এই পর্যন্ত শুনে টুনু বলল, তুমি যে ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করলে। কোথায় মাসের নাম মার্চ আর কোথায় রোমের রাজা রেমাস।

আমি বললাম, আগে শোনই না আর একটু। রোমান কিংবদন্তী বলে যে রেমাস এবং তাঁর যমজ ভাই রোমুলাস যুদ্ধের দেবতা মার্সের পুত্র। রোমানদের এই একটি মাত্র দেবতা যাঁর ধ্যানধারণার মধ্যে গ্রীক, ফোনেশিয়া বা মিশর কোনো দেশেরই প্রভাব নেই। শুরুতে মার্স ছিলেন চাষবাস এবং পশু সংরক্ষণের দেবতা। তাঁর মন্দিরে তাই ওক-ডুমুর প্রভৃতি গাছ, কাঠঠোকরা জাতীয় পাখি এবং ঘোড়া-নেকড়ে প্রভৃতি জন্তুর ছবি আকচার আঁকা হতো। শোনা যায় রেমাস এবং রোমুলাসকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে লালনপালন করেছিল একটি মা-নেকড়ে।

সে যাই হোক, পরের যুগে কিন্তু যুদ্ধের দেবতা হিসেবেই মার্স প্রতিষ্ঠা পান। শুধু রোমেই নয় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যুদ্ধের দেবতা মার্স পুজো পেতেন। জুলিয়াস সীজার ইংলন্ড অভিযানে গিয়ে সেখানে মার্সের মন্দির দেখেছিলেন। মার্সের প্রতীক বর্শা এবং ঢাল। দেবরাজ জুপিটারের চেয়েও মার্সের প্রভাব বেশি ছিল যুদ্ধবাজ রোমানদের ওপর। প্রতি বছর বসন্তোৎসবের সময়ে তাঁকে উৎসর্গ করা হতো ষাঁড়, ভেড়া এবং শূকর আর অক্টোবরে উৎসর্গ করা হতো ঘোড়া। এঁর নাম অনুসারেই রোমান ক্যালেন্ডারের গোড়ার মাসটির নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল মার্চ। পরে এটা বদলায়।

টুনু বলল, একেবারে শুরুতেই যুদ্ধ!

আমি বললাম, শুধু যুদ্ধ কেন চাষবাসও তো আছে। শীতের শেষে এই সময় থেকেই তো আবার কাজকর্ম স্বাভাবিক ভাবে চলতে শুরু করে।

চাষবাস, যুদ্ধ ইত্যাদির প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই তাই দেবতা মার্সকে স্মরণ করার ব্যবস্থা।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেংগল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

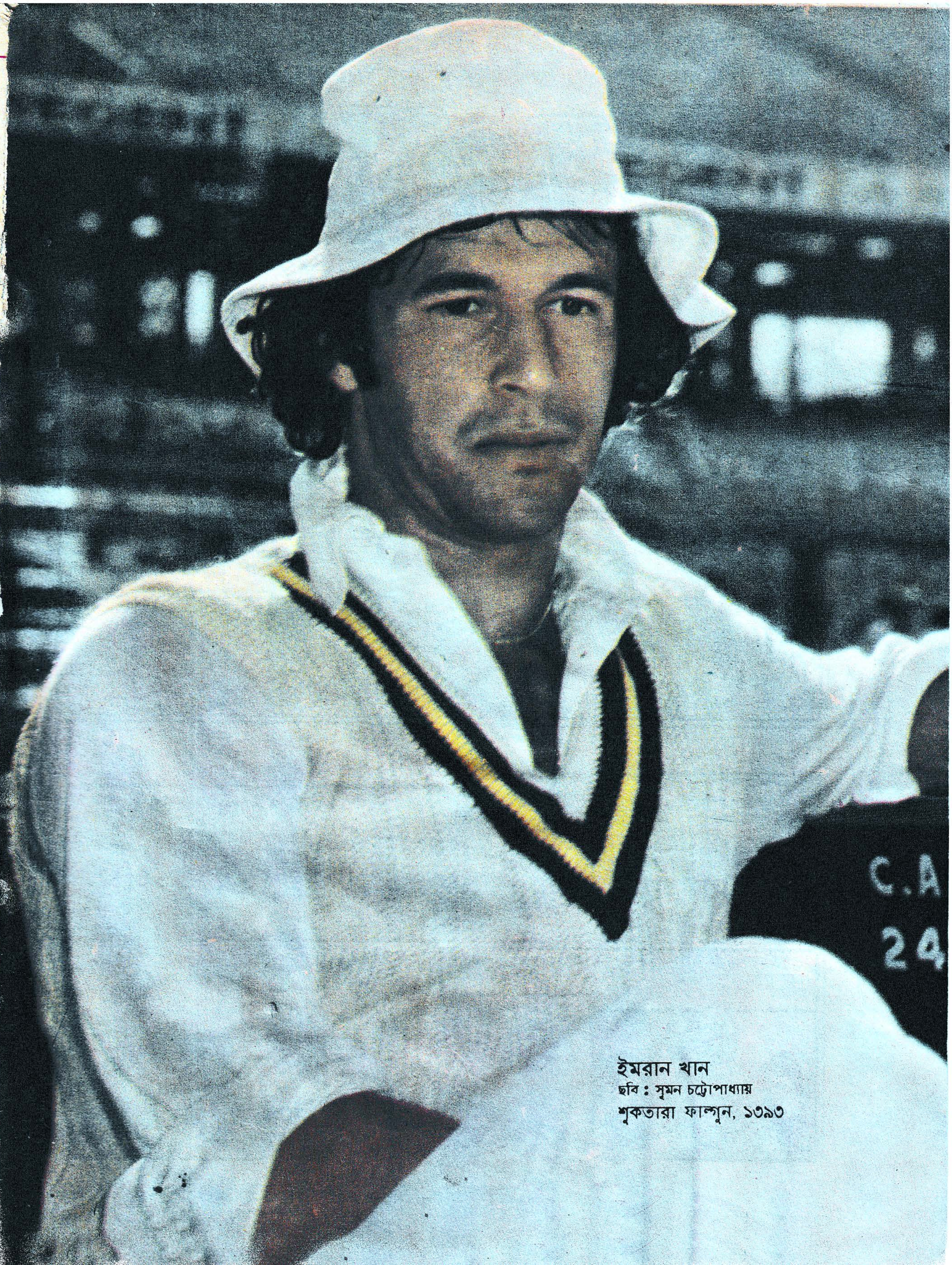

ইমরান খান
ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়
শুকতারা ফাল্গুন, ১৩৯৩

Registration No. W.B./E.C.—60 February '87 "Suktara"

everest/86/PP/413-bn